ফেলুদা সমগ্র

গোসাঁইপুর সরগরম

সত্যজিৎ রায়

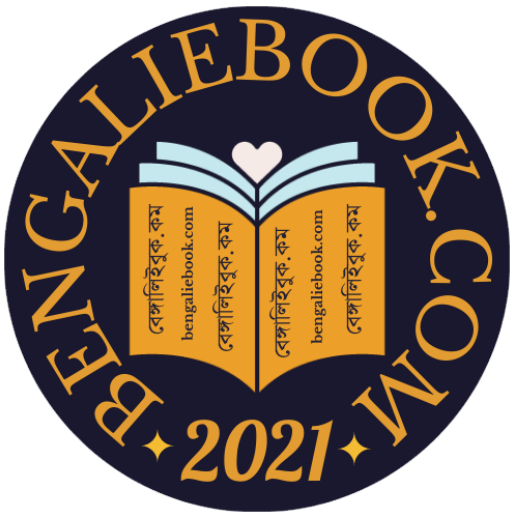

সূচিপত্র

১. থ্রি মাস্কেটিয়ারস 2
২. মল্লিক বাড়িও যে অনেক' দিনের পুরনো..... 11
৩. তুলসীবাবু আর জটায়ু..... 21
৪. গ্রামটা ঘুরে দেখে 27
৫. শ্যামলাল মল্লিক জখম হননি বটে..... 36
৬. মুখের চেহারা কী হয়েছে 42
৭. মূকাভিনেতা বেণীমাধব 47
৮. হাতে হাতকড়া 52

১. থ্রি মাস্কেটিয়ারস

গোসাঁইপুরে আপনার চেনা একজন কে থাকেন না? রহস্য-রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক জটায়ু ওরফে লালমোহন গাঙ্গুলীকে জিজ্ঞেস করল ফেলুদা।

আমরা, থ্রি মাস্কেটিয়ারস, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখে হাঁটতে হাঁটতে একেবারে গঙ্গার ধারে পৌঁছে গেছি। প্রিন্সেপ ঘাটের কাছে যে গম্বুজওয়ালা ঘরটা আছে সেটার মধ্যে বসে চানাচুর আর গঙ্গার হাওয়া খাচ্ছি। সময় হচ্ছে বিকেল পাঁচটা, তারিখ অক্টোবরের তেরোই। আমাদের সামনেই জলের মধ্যে একটা বয়া ভাসছে, সেটার ব্যবহার কী সেটা লালমোহনবাবুকে বুঝিয়ে দিয়ে ফেলুদা প্রশ্ন করল। ভদ্রলোক বললেন, আছে। বইকী। তুলসীবাবু। তুলসীচরণ দাশগুপ্ত। এথিনিয়ামে অঙ্ক আর জিয়োগ্রাফি পড়াতেন। রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিটে থাকতেন, এখন রিটায়ার করে চলে গেছেন গোসাঁইপুর। ওখানে পৈতৃক বাড়ি আছে। ভদ্রলোক তো কতবার আমাকে যাবার জন্য লিখেছেন। আমার বিশেষ ভক্ত, জানেন তো? নিজেও গল্প-টল্প লেখেন, ছোটদের জন্য। সন্দেশে গোটা দুই বেরিয়েচে। -কিন্তু হঠাৎ গোসাঁইপুর কেন?

ওখান থেকে একটা চিঠি এসেছে। লিখেছেন জীবনলাল মল্লিক। শ্যামলাল মল্লিক, তস্য পুত্র জীবনলাল। বংশ-পরিচয় তৃতীয় খণ্ড খুলে দেখলাম গোসাঁইপুরের জমিদার ছিলেন এই মল্লিকরা।

ফেলুদা থামল। কারণ একটা জাহাজ প্রচণ্ড জোরে ভোঁ দিয়ে উঠেছে। আজই সকালে গোসাঁইপুরের চিঠিটা এসেছে সেটা জানি। যদিও তাতে কী লেখা ছিল জানি না। চিঠিটা পড়ে ফেলুদা একটা চারমিনার ধরিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে ছিল সেটা লক্ষ করেছিলাম।

কী লিখেছেন ভদ্রলোক? লালমোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

লিখেছেন তাঁর পিতাকে নাকি কেহ বা কাহারা হত্যা করার সংকল্প করেছে। আমি গিয়ে যদি ব্যাপারটার একটা কিনারা করতে পারি তা হলে উনি বিশেষ কৃতজ্ঞ বোধ করবেন এবং আমাকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান করবেন।

চলুন না মশাই বললেন লালমোহনবাবু। বেশ তো ঝাড়াঝাপটা এখন; আমার নতুন বই বেরিয়ে গেছে। আপনার হাতেও ইমিডিয়েট কিছু নেই, তা ছাড়া হিল্লি-দিল্লি তো অনেক হল, এবার স্বাদবাদলের জন্য পল্লীগ্রামটা মন্দ কী? কাছেই সেগুনহাটিতে শুনিচি বিরাট মেলা হয় এই সময়টাতেই। চলুন স্যার, বেরিয়ে পড়ি।

ওঁদের বাড়িতে নাকি থাকার অসুবিধে আছে, তাই মাইল তিনেক দূরে শ্রীপুরে কোন এক চেনা বাড়িতে আমার ব্যবস্থা করবেন বলেছেন। সাইকেল রিকশাতে যাতায়াত। আমার মনে হচ্ছিল গোসাঁইপুরেই থাকতে পারলে সুবিধে হত। তাই আপনার বন্ধুটির কথা জিজ্ঞেস করলাম।

আমার বন্ধু উইল বি ড্যাম গ্র্যাড। আর আপনি যাচ্ছেন শুনলে তো কথাই নেই। উনি আপনার দারুণ ভক্ত।

আর কার কার ভক্ত সেটা জেনে নিই।

লালমোহনবাবু এই খোঁচা-দেওয়া প্রশ্নটাকেও সিরিয়াসলি নিয়ে বললেন, জগদীশ বোসের নাম করতে শুনিচি এককালে, বলতেন। অত বড় মনীষী পৃথিবীতে নেই; আর গোবরবাবুর কাছে বোধহয় ছেলেবেলা কুস্তি শিখেছে; আর–

আর, ওই যথেষ্ট।

***

গোসাঁইপুর যেতে গেলে কাটায়া জংশনে নেমে বাস ধরতে হয়। কাটায়া থেকে সাত মাইল; তার মানে বড় জোর আধা ঘণ্টা। শ্যামলাল তস্য পুত্র জীবনলালকে ফেলুদা লিখে

দিয়েছিল। আমরা আসছি বলে, আর বলেছিল গোসাঁইপুরেই আমাদের থাকার বন্দাবস্ত হয়েছে। এদিকে তুলসীবাবু জটায়ুর চিঠি পাওয়া মাত্র উত্তর দেন। শুধু যে খুশি হয়েছেন তা নয়, লিখেছেন গোসাঁইপুর সাহিত্য সংঘ ফেলুদা আর লালমোহনবাবুকে একটা জয়েন্ট সংবর্ধনা দেবার আয়োজন করতে চায়। লালমোহনবাবুর একেবারেই আপত্তি ছিল না, কিন্তু ফেলুদা কথাটা শুনেই চোখ রাঙিয়ে বলল, দেশে ক্রাইম বন্ধ হয়ে গেলে গোয়েন্দাদের হাঁড়ি চড়ে না। কী অবস্থায় কাজ করছি সেটা বুঝতে পারছেন? এতে আমার সংবর্ধনার কী আছে মশাই? আর বলে দিন যে আমার পরিচয়টা দিয়া করে যেন গোপন রাখেন, নইলে তদন্তের বারোটা বেজে যাবে।

লালমোহনবাবুকে বাধ্য হয়েই আদেশ পালন করতে হল। তবে এটাও লিখলেন যে সংবর্ধনা নিতে ওঁর নিজের কোনও বাধা নেই। এই অনুষ্ঠানের কথা ভেবেই বোধহয় উনি নীল সুতোয় চিকানের কাজ করা একটা মলমলের পাঞ্জাবি সঙ্গে নিলেন।

তুলসীবাবু জানিয়ে রেখেছিলেন যে গোসাঁইপুর গ্রামে ঢোকবার মুখে যোগেশের মুদির দাকানে তিনি আমাদের জন্য অপেক্ষা করবেন। সেখান থেকে তাঁর বাড়ি দশ মিনিটের হাঁটা পথ।

কাটোয়া থেকে বাস ধরে গোসাঁইপুর যাবার পথে একটা পালকি দেখে বেশ অবাক লাগল। ফেলুদা আর লালমোহনবাবুও দেখলাম ঘাড় ফিরিয়ে কিছুক্ষণ দেখল পালকিটাকে।কোন সেঞ্চরিতে এসে পড়লাম মশাই, বললেন লালমোহনবাবু, গোসাঁইপুরে বিজলি পৌঁছেচে তো? এতটা অজ পাড়াগাঁ বলে তো আমার ধারণা ছিল না।

বাসের কন্ডাকটার যোগেশের দোকানের নাম জানে, তাকে বলা ছিল। ঠিক জায়গায় চেরা গলায় গোসাঁইপুর, গোসাঁইপুর। বলে দুটো চিৎকার দিয়ে বাস থামিয়ে আমাদের নামিয়ে দিল। যে ভদ্রলোক লালমোহনবাবুর দিকে হাসি মুখে এগিয়ে এলেন তিনি যে এককালে ইস্কুলমাস্টার ছিলেন সেটা আর বলে দিতে হয় না। ভদ্রলোকের হাতে তাপ্পি-মারা ছাতা, পায়ে ব্রাউন কেড্‌স জুতো, চোখে চশমা, পরনে হাফ পাঞ্জাবি আর খাটা করে পরা ধূতি,

আর বগলে একটা মান্ধতার আমলের পুরনো ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিন। ফেলুদার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে ভদ্রলোক হেসে চোখ টিপে বললেন, আপনার আদেশ পালন করিচি-কোনও চিন্তা নেই। আপনি হলেন টুরিস্ট, হোল লাইফ ক্যানাডায় কাটিয়েছেন, দেশে ফিরে পাড়াগাঁ দেখার শখ হয়েছে। ভাবলুম আপনি যদি তদন্তের ব্যাপারেই এসে থাকেন, তা হলে তল্লাশির জন্য এখেনে-সেখেনে ঘাপটি মারতে হতে পারে, কাজেই সেফ সাইডে থাকা ভাল। টুরিস্টদের উগ্র কৌতুহল থাকে সেটা সকলেই জানে।

আপনার বাড়িতে ক্যানাডা সম্বন্ধে তথ্যওয়ালা বই আছে আশা করি? ফেলুদা হেসে বলল।

কোনও চিন্তা নেই, আবার বললেন তুলসীবাবু। তারপর লালমোহনবাবুর দিকে ফিরে বললেন, আর গাঙ্গুলী ভায়া, তোমাকে কিন্তু একটু ঝক্কি পোয়াতে হচ্ছে, তাঁরশু অর্থাৎ শুকুরবার, আমাদের নিউ প্রাইমারি স্কুলে একটা ফাংশন অ্যারেঞ্জ করিচি। সুরেশ চাকলাদার উকিল পৌরোহিত্য করবেন। কিছু না—একটু নাচ গান, দুটো আবৃত্তি, দুটো ভাষণ। এই আর কী ! আমাদের পোস্টমাস্টার হরিহরের ছেলে বলদেব ভাল ছবি আঁকে, সে একটা মানপত্র লিখছে। ভাষাটা অবিশ্যি, হে হে, আমার।

অলংকারের আবার বেশি বাড়াবাড়ি-, কাঁচা রাস্তায় কীসে জানি ঠোক্কর খাওয়াতে লালমোহনরূকুর কথা শেষ হল না। কিন্তু বাকিটা বুঝে নিয়েই তুলসীবাবু বললেন, তা এ সব ব্যাপারে একটু তো বাড়াবাড়ি হবেই। আর তোমার মতো সাকসেসফুল অথর আর কাঁটা এসেছে বলে এখেনে। লাস্ট এসিচিল। পরীক্ষিত চাটুজ্যে।-তাও সিকস্‌টি সেভেনে।

ফেলুদা বলল, আসবার পথে একটা পালকি দেখলাম। এদিকে এখনও পালকি ব্যবহার হয় নাকি?

শুধু পালকি? তুলসীবাবু ছাতার বাড়িতে একটা বাছুরকে পথ থেকে সরিয়ে বললেন, "আপনি বিগত যুগের কোন জিনিসটা চান বলুন। পাইক-বীরকন্দাজ? পাবেন। ইকোবরাদার? পাবেন। টানা-পাখা? পাবেন। লম্প-পিদিম-পিলসুজা? পাবেন। –

কিন্তু এখানে তো ইলেকট্রিসিটি আছে দেখছি।

সব জায়গাতেই আছে, কেবল যেখানে সব চাইতে বেশি থাকার কথা সেইখেনেই নেই।

কোথায় মশাই? লালমোহনবাবু প্রশ্ন করলেন।

মল্লিকদের বাড়ি।

আমরা তিনজনেই অবাক হয়ে ভদ্রলোকের দিকে চাইলাম।

মল্লিক মানে শ্যামলাল মল্লিক? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

ওই একটিই তো মল্লিক গোসাঁইপুরে। এখেনকার জমিদার ছিলেন ওঁরা। দুর্লভ মল্লিকের নামে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খেত। শ্যামলাল তাঁর ছেলে। জমিদারি উচ্ছেদ হবার পর কলকাতায় গিয়ে প্লাস্টিকের ব্যবসা করে বিস্তর টাকা করিছিল। একদিন অন্ধকারে হাতড়ে ঘরের সুইচ জ্বালতে গোসল, সুইচ বোর্ডে একটা খোলা তার ছিল, তাতে হাত লেগে যায়। এ সি কারেন্ট মশাই, হাত আঁটকে গিয়ে হুলুস্থুল ব্যাপার। হাসপাতালে ছিল বেশ কিছুদিন। বেরিয়ে এসে ব্যবসা ছেলের হাতে তুলে দিয়ে গোসাঁইপুরে চলে আসে। এসেই ইলেকট্রিক কানেকশন কেটে দেয়। শুধু সে হলে না হয় তবু বোঝা যেত। সেই সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর সব কিছু বাতিল করে দিয়েছে। চুরুট ছেড়ে গড়গড়া ধরেছে ; ফাউনটেন পেন ব্যবহার করে না ; টুথব্রাসের বদলে দাঁতন। ইংরিজি বই যা ছিল বাড়িতে সব বেচে দিয়েছে, নিজের গাড়িটা বেচে দিয়েছে, তার জায়গায় পালকি হয়েছে। একটা পুরনো ভাঙা পালকি বাড়িতেই ছিল, সেটাকে সারিয়ে নিয়েছে, তার জন্য চারটি বেহারা বহাল হয়েছে। বিলিতি ওষুধ যা ছিল সব নর্দমায় ফেলে দিয়েছে; এখন ওনলি কবরেজি। ফাঁকতালে তারক কবরেজের কপাল ফিরে গেছে। আরও কত কী যে করেছে তার হিসেব নেই। এখেনে যখন এসেছেন তখন আলাপ হবে নিশ্চয়ই; তখন সর্ব্ব জানতে পারবেন।

আলাপ না হয়ে উপায় নেই বলল ফেলুদা। আমি এসেছি ওঁর ছেলের কাছ থেকে তলব পেয়ে।

হ্যাঁ, তা ছেলে। ক'দিন হল এসেছে বটে। কিন্তু রহস্যটা কী?

শ্যামলাল মল্লিককে খুন করার চেষ্টা চলেছে বলে কোনও খবর আপনার কানে এসেছে কি?

তুলসীবাবু কথাটা শুনে বেশ অবাক হলেন।কই তেমন কিছু শুনিনি। তা খুন করার কথাই যদি বলেন, তার জন্যে বাইরের লোকের দরকার কী? ঘরেই তো রয়েছে।

কীরকম?

ওই যিনি আপনাকে তলব দিয়েছেন, তার সঙ্গে বাপের তো বনিবনা নেই একদম। এখেনে এলেই তো ঝগড়াঝাটি হয়। অবিশ্যি আমি জীবনলালকে দোষ দিই না। ওরকম উদ্ভট খেয়াল যে কাপের, তাকে কোন ছেলে মানবে বলুন। জীবনলালকে তো এসে। ওই বাড়িতেই থাকতে হয়। ওই ভূতের বাড়িতে মাথা ঠিক রাখা খুব মুশকিল।

এক বিঘে জমির উপর তুলসীবাবুর কোঠাবাড়ি, বললেন বয়স নাকি প্রায় একশো। বাপ-ঠাকুরদা দুজনেই মোক্তারি করতেন, বাড়িটা ঠাকুরদাই বানিয়েছেন। তুলসীবাবুর স্ত্রী কলকাতাতেই মারা গেছেন। একটি মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, তার স্বামী লোহা-লক্কড়ের ব্যবসা করে আজিমগঞ্জে। দুই ছেলের একজনের সাইন পেন্টিং-এর ব্যবসা আছে কলকাতায়, আরেকজন ওষুধের সেলসম্যান। এখানে তুলসীবাবু একই থাকেন। –তবে কী জানেন, পাড়াগাঁয়ে এক মনে হয় না। এখানে সবাই পরস্পরের খোঁজখবর রাখে, রোজই দেখা হয়, মেলামেশাটা অনেক বেশি।

বিকেল চারটে নাগাত তুলসীবাবুর বাড়িতে পৌঁছে হাত মুখ ধুয়ে প্রথমেই চায়ের আয়োজন হল। ফেলুদা সঙ্গে ভাল চা এনেছিল, কারণ ওই একটা ব্যাপারে ও সত্যিই

খুঁতখুঁতে। অবিশ্যি সে চা সকলেই খেল, আর তার সঙ্গে চিড়ে-নারকেল। জোগাড়-যন্ত্র করল তুলসীবাবুর চাকর গঙ্গা।

একতলার দুটো ঘরের একটাতে তুলসীবাবু নিজে থাকেন, দোতালার ছাতে একটা বড় ঘর, তাতে তিনটে তক্তপোষা পেতে আমাদের জন্য বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এ ঘর নাকি তুলসীবাবুর মেয়ে-জামাই তাদের ছেলেপুলে নিয়ে বছরে একবার করে এসে থেকে যায়।

চা খেতে খেতে ফেলুদা বলল, আমাকে কিন্তু একবার ওই বিজলিহীন বাড়িতে যেতে হবে জীবনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। ওঁকে লিখে জানিয়েছি যে সাড়ে পাঁচটা নাগাত যাব।

তুলসীবাবু বললেন, তা বেশ তো, আমি পৌঁছে দেবখন। মল্লিকবাড়ি পাঁচ-সাত মিনিটের পথ। তবে গাঙ্গুলীভায়াকে আমি ছাড়াচি নে। আজ সন্ধেবেলা কিছু লোক আসবে আমার এখেনে; একটু সদালাপ করতে চান সাহিত্যিকের সঙ্গে। মিত্তির মশাই ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে আসবেন তো?

কেন বলুন তো?

একবার আত্মারামবাবুর ওখানে আপনাকে নিয়ে যেতে চাই। উনি গোসাঁইপুরের একটি অ্যাট্রাকশন।

আত্মারামবাবু?

আসল নাম অবিশ্যি মৃগেন ভটচায। আত্মা-টাত্মা নিয়ে চর্চা করেন। তাই এখানকার কয়েকজন নাম দিয়েছে আত্মারাম। আমি দিইনি কিন্তু! আমার ধারণা ভদ্রলোকের মধ্যে সত্যিই ইয়ে আছে।

আত্মা নিয়ে চাঁচটা যে কী সেটা আর জিজ্ঞেস করা হল না। কারণ ঠিক তখনই আবার দেখতে পেলাম পালকিটাকে। আমরা বাইরের দাওয়ায় বসে চা-চিড়ে খাচ্ছিলাম,

সামনেই রাস্তা, আর সেই রাস্তা দিয়েই পালকিটা আসছে। এবার দেখতে পেলাম যে ভিতরে একজন লোক বসে আছে।

ভদ্রলোক পালকির দরজা দিয়ে বাইরে উঁকি মারছিলেন। বেহারিাগুলো ঠিক গল্পে যেরকম পড়া যায় সেইভাবে হুমাহাম শব্দ করতে করতে এগোচ্ছিল, এমন সময় শব্দের সঙ্গে সঙ্গে পালকিটাও থেমে গেল।

পালকি মাটিতে নামতেই, তার ভিতর থেকে একজন বছর পয়ত্রিশের ভদ্রলোক বেশ কষ্ট করে বাইরে বেরিয়ে আরও খানিকটা কষ্ট করে উঠে দাঁড়ালেন। সমস্ত ব্যাপারটা বেমানান, কারণ ভদ্রলোকের স্মার্ট কলকাতিয়া চেহারা, গায়ে বুশ শার্ট আর টেরিলিনের প্যান্ট।

মিস্টার মিত্তির? ফেলুদার দিকে এগিয়ে এসে হাসি মুখে প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আমার নাম জীবনলাল মল্লিক।

বুঝেছি। ইনি আমার বন্ধু মিস্টার গাঙ্গুলী, আর এ হল আমার খুড়তুতো ভাই তপেশ। তুলসীবাবুর সঙ্গে বোধহয় আপনার পরিচয় আছে।

আমার নাম জীবনলাল মল্লিক।

তুলসীবাবুর সঙ্গে বোধহয় আপনার পরিচয় আছে!

জীবনবাবু পালকিটাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, আমার বাড়ি মিনিট পাঁচেকের হাঁটা পথ। আসবেন একবারটি? আপনাদের চা খাওয়া হয়েছে? একটু কথা ছিল।

লালমোহনবাবু রয়ে গেলেন, আমি আর ফেলুদা ভদ্রলোকের সঙ্গে মল্লিকবাড়ি রওনা দিলাম। রাস্তা ছেড়ে একটা বাঁশ বনে ঢুকে বুঝলাম এটা শর্টকাট। জীবনবাবু বললেন, কলকাতায় একটা টেলিফোন করার দরকার ছিল, তাই স্টেশনে যেতে হল।

পালকি ছাড়া গতি নেই বুঝি?।

জীবনবাবু ফেলুদার দিকে আড়চাখে চেয়ে বললেন, আপনাকে তুলসীবাবু বলেছেন বুঝতে পারছি।

হ্যাঁ, বলছিলেন ইলেকট্রিক শকের পরিণাম।

পরিণামটা গোড়ায় এত ভয়াবহ ছিল না, আক্রোশটা ছিল, শুধু ইলেকট্রিসিটির বিরুদ্ধে। এখন কী দাঁড়িয়েছে সেটা আমাদের বাড়ি গেলেই বুঝতে পারবেন।

আপনি এখানে প্রায়ই আসেন?

দুমাসে একবার। আমাদের একটা ব্যবসা আছে, সেটা এখন আমাকেই দেখতে হয়। সেই নিয়ে কথা বলতেই আসি।

তা হলে ব্যবসায় এখনও ইন্টারেস্ট আছে আপনার বাবার?

মোটেই না। কিন্তু আমি সেটা চাই না। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছি। যাতে উনি আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন।

কোনও আশা দেখছেন কি?

এখনও না।

২. মল্লিক বাড়িও যে অনেক'দিনের পুরনো

মল্লিক বাড়িও যে অনেক'দিনের পুরনো সেটা বলে দিতে হয় না, তবে মেরামতের দরুন বাড়িটাকে আর পোড়ো বলা চলে না। প্রাসাদ না হলেও, অট্টালিকা নিশ্চয়ই বলা চলে এ বাড়িকে। ফটক দিয়ে ঢুকে ডাইনে একটা বাঁধানো পুকুর, বাড়ির দুপাশের ফাঁক দিয়ে পিছনে গাছপালা দেখে মনে হয়। ওদিকে একটা বাগান রয়েছে। পাঁচিলটা মেরামত হয়নি, তাই এখানে ওখানে ফাটল ধরেছে, কয়েক জায়গায় আবার দেয়াল ভেঙেও পড়েছে।

ফটকে একজন দারোয়ান দেখলাম যার হাতে সড়কি আর ঢাল দেখে মনে হল কোনও ঐতিহাসিক নাটকে নামার জন্য তৈরি হয়েছে। সদর দরজার পাশেই ঠিক ওই রকমই হাস্যকর পোশাক-পরা একজন বীরকন্দাজ জীবনবাবুকে দেখে এক পোল্লায় সেলাম ঠুকল। এই থমথমে পরিবেশেও এই ধরনের সব অবিশ্বাস্য ব্যাপার দেখে হাসি পাচ্ছিল।

আমরা একতলাতেই বৈঠকখানায় ফরাসের উপর বসলাম। ঘরে চেয়ার নেই। দেয়ালে যা ছবি আছে সবই হয় দেবদেবীর, না হয় পৌরাণিক ঘটনার। দেয়ালের আলমারির একটা তাকে গোটা দশেক বাংলা বই দেখলাম, বাকি তাকগুলো মনে হল খালি।

আপনাদের পাখা লাগবে কি? তা হলে দাসুকে লাগিয়ে দিই।

এতক্ষণ লক্ষ করিনি, এবার দেখলাম মাথার উপর ঝালরওয়ালা ডবল-মাদুর একটা কাঠের ডাণ্ডা থেকে ঝুলছে, আর ডাণ্ডাটা ঝুলছে সিলিং-এ দুটো আংটা থেকে। ডাণ্ডা থেকে দড়ি বেরিয়ে বার্ট দিকের একটা দরজার উপর দেয়াল ফুড়ে বারান্দায় চলে গেছে। এই হল টানা-পাখা, যেটা টানা হয় বারান্দা থেকে, আর হাওয়া হয়। ঘরে। অক্টোবর মাস, সন্ধে হয়ে এসেছে তাই গরম নেই; পাখার আর দরকার হল না।

এটা কী জানেন?

জীবনবাবু আলমরিটা খুলে তার থেকে একটা গামছা, টাইপের চারকোনা কাপড় বার করে ফেলুদাকে দেখালেন। সেটার বিশেষত্ব এই যে তার এককোণে গেরো দিয়ে বাঁধা রয়েছে একটা পাথরের টুকরো।

গামছাটা হাতে নিয়ে ফেলুদার ভুরু কুঁচকে গেল। সে পাথরের উল্টো দিকের কোনটা হাতে নিয়ে গামছাটাকে বার কয়েক শূন্যে ঘুরিয়ে বলল, তোপ্‌সে, উঠে দাঁড়া তো।

আমি দাঁড়ালাম আর সেই সঙ্গে ফেলুদাও দাঁড়াল আমার থেকে হাত তিনেক দূরে। তারপর গামছা হাওয়ায় ঘুরিয়ে হাতে ধরা অবস্থাতেই জাল ফেলার মতো করে আমার দিকে ছুঁড়ে দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে পাথরের দিকটা আমার গলায় পেঁচিয়ে গেল।

ঠগী! আমি বলে উঠলাম।

ফেলুদাই বলেছিল এককালে আমাদের দেশে ঠগীদের দস্যুগিরির কথা। তারা ঠিক এইভাবে পথচারীদের গলায় ফাঁস দিয়ে হ্যাঁচকাটানে তাদের খুন করে সর্বস্ব লুট করে নিত।

ফেলুদা অবিশ্যি গামছা ধরে টান দেয়নি। সে তক্ষুনি পাঁচ খুলে নিয়ে ফরাসে বসে বলল, এ জিনিস আপনি কোথায় পেলেন?

মাঝ রাত্তিরে বাবার ঘরের জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলেছিল কেউ।

কবে?

আমি আসার কয়েক'দিন আগে।

এত পাহারা সত্ত্বেও এটা হয় কী করে?

পাহারা? জীবনবাবু হেসে উঠলেন।পাহারা তো শুধু পোশাকের বাহারে মশাই, মানুষগুলো তো সব গেয়া ভূত, কুঁড়ের হদ্দ। আর তারাও তো বুঝতে পারে বাবুর ভীমরতি ধরেছে।

কাজ যা করে সে তো শুধু নাম কা ওয়াস্তে। নেহাত বাড়িতে ডাকাত পড়েনি। তাই, নইলে বোঝা যেত কার দৌড় কতদূর।

এ বাড়িতে আর কে কে থাকেন জানতে পারি কি?

বাবা ছাড়া আর আছেন আমার বিধবা ঠাকুমা। তিনি প্রাচীন আমলের লোক তাই দিব্যি আছেন। তা ছাড়া আছেন ভোলানাথবাবু। একে বাজার সরকার বলতে পারেন, ম্যানেজার বলতে পারেন– বাবার ফাইফরমাশ খাটা, দেখাশোনা করা, সবই ইনি করেন। বাবার অসুখ-বিসুখ হলে কবিরাজ ডাকতে হয়, সেটিও ইনিই করেন। কোনও কাজে শহরে যাবার দরকার হলেও ইনিই যান। ব্যস-এ ছাড়া আর কেউ নেই। অবিশ্যি চাকর আছে; একটি রান্নার লোক, দুটি দারোয়ান, একটি এমনি চাকর-এর বাড়িতেই থাকে। পালকির লোক আর পাঙখাওয়ালা কাছেই গ্রাম থেকে আসে।

এই ভোলানাথবাবু কোথাকার লোক? ক'দিন আছেন?

উনি এই গ্রামেরই লোক। আমাদের প্রজা ছিলেন। বাপ-ঠাকুরদা চাষবাস করত। ভোলাবাবু নিজে ইস্কুলে পড়েছেন, বেশ বুদ্ধিমান ছেলে ছিলেন। এখন বয়স ষাটের কাছাকাছি।

উনি কি আপনার পিতামহ?

ফেলুদা দেয়ালে একটা ছবি দেখিয়ে প্রশ্ন করল। বিরাট এক জোড়া পাকানো গোঁফ নিয়ে এক জমিদার বাঁ হাত শ্বেত পাথরের টেবিলের উপর রেখে ডান হাতে একটা রূপোয় বাঁধানো লাঠি ধরে চেয়ারে বসে আছেন। দেখলেই মনে হয় যাকে বলে দোর্দণ্ডপ্রতাপ।

হ্যাঁ, উনিই দুর্লভ সিংহ।

যাঁর নামে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খেত?

জীবনবাবু হেসে উঠলেন।

বাঘ অবিশ্যি এককালে থাকলেও, ঠাকুরদার আমলে ছিল না; তবে হ্যাঁ, ডাকসাইটে জমিদার ছিলেন ঠিকই। এবং শেমফুলি অত্যাচারী।

একজন চাকর একটা ট্রেতে করে একটা পেয়ালা আর দুটো গেলাসে কী যেন নিয়ে এল।

তা হলে চায়ের পাট উঠিয়ে দেননি আপনার বাবা?

আলবত দিয়েছেন। এটা অবিশ্যি চা না, কফি। আমার নিজের একটি কাপ এবং একটিন নেসক্যাফে আমি সঙ্গে করে নিয়ে আসি। সকল সন্ধে একতলায় বসে খাই। তাই আপনাদের জন্য গেলাস; কিছু মনে করবেন না।

মনে করব কেন? এ তো খাঁটি মাদ্রাজি সিসটেম। কোমলা বিলাসে এইভাবে কাসার পাত্রে খেয়েছি। কফি।

দোতলা থেকে মাঝে মাঝেই একটা খটাস খটাস শব্দ পাচ্ছিলাম; সেটা যে কীসের শব্দ সেটা ফেলুদার প্রশ্ন থেকে বুঝতে পারলাম।

আপনার বাবা বুঝি খড়ম ব্যবহার করেন?

জীবনবাবু একটু হেসে বললেন, সেটাই স্বাভাবিক নয় কি?

এই ঠগীর গামছা ছাড়া আর কী থেকে আপনার ধারণা হল যে আপনার বাবার জীবন বিপন্ন?

জীবনবাবু এবার তাঁর পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে ফেলুদাকে দিলেন। তাতে গোটা গোটা পেনসিলের অক্ষরে লেখা–

তোমার পূর্বপুরুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তোমার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। অতএব প্রস্তুত থাকো?

এটা এসেছে ৫ই অক্টোবর, আমি আসার আগের দিন। পোস্ট করা হয়েছিল কাটায়া থেকে। এখান থেকে যে-কেউ গিয়ে ডাকে ফেলে আসতে পারে।

কিছু মনে করবেন না–পূর্বপুরুষের পাপটা কী সে ব্যাপারে কিছু আলোকপাত করতে পারলে সুবিধে হত।

বুঝতেই তো পারছেন, বললেন জীবনবাবু, একটা জমিদার বংশের ইতিহাসে অন্যায়ের তো কতরকম দৃষ্টান্ত থাকতে পারে। কোন পাপের কথা বলছে সেটা কী করে বলি বলুন! আমার ঠাকুরদাদা দুর্লভ মল্লিকই তো কতরকম অত্যাচার করেছেন প্রজাদের উপর।

এটা পেয়ে পুলিশে খবর দিলেন না কেন?

দুটো কারণে, একটু ভেবে বললেন জীবনবাবু। এক, এখানে আপনাকে কেউ চিনবে না, তাই যে-লোক হুমকি দিচ্ছে সে সাবধানতা অবলম্বন করার অতটা তাগিদ অনুভব করবে: না। দুই, পুলিশ এলে প্রথমে আমাকে সন্দেহ করবে।

আমরা দুজনে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলাম ভদ্রলোকের দিকে। জীবনবাবু বলে চললেন, বাবার এই অদ্ভুত পরিবর্তনের পর থেকে আমার সঙ্গে তাঁর আর কনিবনা নেই। আমরা শহুরে মানুষ, বিজ্ঞানের অবদানগুলো অত সহজে বর্জন করা আমাদের চলে না মশাই। এটা ঠিক যে ইলেকট্রিক শকের ফলে বাবা মানসিক শকও পেয়েছিলেন সাংঘাতিক। ঘটনাটা ঘটে পাঁচ বছর আগে। আমি আর বাবা আপিস থেকে ফিরে একসঙ্গে বৈঠকখানায় ঢুকি। অন্ধকারে বাতি জ্বালতে গিয়ে সুইচবোর্ডে একটা খোলা তারে বাবার হাত আটকে যায়। বাইরেই ছিল মেইন সুইচ, আমি দৌড়ে গিয়ে পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে অফ করি। তবু কেন জানি বাবার ধারণা হয় যে আমি ব্যাপারটা আরও তাড়াতাড়ি করতে পারতাম। সেই তখন থেকেই। যাই হাক, এখানে এলেই কথা কাটাকাটি হয়। একবার তো রেগে গিয়ে

একটা জ্বলন্ত কেরোসিনের ল্যাম্প ছুড়ে ফেলে দিই। তার ফলে ফরাসে আগুন-টাগুন ধরে হুলুস্কুল ব্যাপার। পাড়াগাঁতে খবরটা রটে যায়। তারপর থেকে সবাই জানে শ্যাম মল্লিকের সঙ্গে তার ছেলের সাপে-নেউলে সম্পর্ক। কাজেই বুঝতেই পারছেন কেন পুলিশ ডাকিনি। অবিশ্যি আপনাকে ডাকার আরেকটা কারণ হল আপনার খ্যাতি। আর আমার বিশ্বাস একজন আধুনিক শহুরে লোক সমস্যাটা আরও ভাল বুঝতে পারবে।

নেসক্যাফে শেষ হবার আগেই ঘরে ল্যাম্প চলে এসেছে। ওপরে পাঁচালিও বন্ধ হয়েছে। জীবনবাবু বললেন, আপনি বাবার সঙ্গে কি একবার দেখা করতে চান?

সেটা হলে মন্দ হত না।

সামান্য কাঁটা ল্যাম্প-লণ্ঠনের আলোয় এত বড় বাড়ির অনেকখানি যে অন্ধকার থেকে যাবে তাতে আর আশ্চর্য কী? সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় জীবনবাবু পকেট থেকে ছোট্ট একটা টর্চ বার করে জ্বেলে বললেন, এটাও লুকিয়ে আনা।

শ্যমলাল মল্লিক তাঁর নিজের ঘরে ফরাসে বসে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে গড়গড়ার নল হাতে নিয়ে বসে আছেন। জীবনবাবু আর নীচের ছবির দুর্লভবাবু, এই দুজনের সঙ্গেই ভদ্রলোকের চেহারার মিল আছে। হয়তো এই চেহারায় দুর্লভ সিংহের গোঁফ জুড়ে দিলে এঁকেও ডাকসাইটে বলে মনে হয়। এই অবস্থায় দেখে ভয় করে না, যদিও কথা বললে গলার গভীর স্বরে মনে হয় রাগালে ভয়ংকর হতে পারে।

আপনি এবার আসুন, গভীর গলায় বললেন শ্যামলালবাবু। যাকে কথাটা বলা হল তিনি ফরাসের এক কোণে বসে ছিলেন। জীবনবাবু তাকে কবিরাজ তারক চক্রবর্তী বলে পরিচয় করিয়ে দিলেন। রোগ ডিগডিগে চেহারা, ঘন ভুরুর নীচে নাকের উপর পুরু কাচের চশমা, নাকের নীচে একজোড়া পুরু গোঁফ। তারক চক্রবর্তী নমস্কার করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

গোয়েন্দা দিয়ে কী হবে? শ্যামলাল মল্লিক ফেলুদার পরিচয় পেয়েই বিরক্তভাবে প্রশ্ন করলেন। এই চক্রান্তের কিনারা গোয়েন্দার কম্মো নয়। আমার শত্রু আমার ঘরেই আছে। এ কথা দুর্লভ মল্লিকের আত্মা বলে দিয়েছেন। সে কথা কাগজে লেখা আছে আমার কাছে। আত্মা ত্রিকালজ্ঞ। জ্যান্ত মানুষ সাহেবি কেতাব পড়ে তার চেয়ে বেশি জানবে কী করে?

জীবনবাবু দেখলাম কথাটা শুনে কেমন জানি থতমত খেয়ে গেলেন। বুঝলাম তিনি ঘটনাটা জানেন না।

আপনি কি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যের বাড়িতে গিয়েছিলেন?

আমি যাব কেন? সে এসেছিল। আমি তাকে ডেকেছিলাম। আমাকে এইভাবে বিব্রত করছে কে সেটা আমার জানার ছিল। এখন জেনেছি।

জীবনবাবু গভীরভাবে বললেন, কবে এসেছিলেন মৃগাঙ্কবাবু?

তুমি আসার আগের দিন।

কই, তুমি তো আমাকে বলনি।

শ্যামলালবাবু কোনও উত্তর দিলেন না। তিনি কথার ফাঁকে ফাঁকে সমানে গড়গড়া টেনে চলেছেন। ফেলুদা বলল, দুর্লভ মল্লিকের আত্মা কী লিখে গেছেন সেটা দেখা যায় কি?

ভদ্রলোক মুখ থেকে গড়গড়ার নল সরিয়ে লাল চোখ করে ফেলুদার দিকে চাইলেন।

তোমার বয়স কত হল?

ফেলুদা বয়স বলল।

এই বয়সে এত আস্পর্ধা হয় কী করে? সে লেখার আধ্যাত্মিক মূল্য জানা তুমি? সেটা কি যাকে-তাকে দেখাবার জিনিস?

আমায় মাপ করবেন, ফেলুদা খুব শান্তভাবেই বলল, আমি শুধু জানতে চেয়েছিলাম আপনার সংকট থেকে কোনও মুক্তির উপায় আপনার পরলোকগত পিতা বলেছেন কি না।

সেটার জন্য কাগজটা দেখাবার কী দরকার? আমাকে জিজ্ঞেস করলেই তো হয়। মুক্তির উপায় একটাই—শত্রুকে বিদায় করো।

কয়েক মুহূর্ত সবাই চুপ। তারপর ধীরকণ্ঠে জীবনলাল বললেন, তুমি তা হলে আমায় চলে যেতে বলছি?

আমি কি তোমাকে আসতে বলেছি কোনওদিন?

জীবনবাবু দেখলাম ছাড়বার পাত্র নন। বললেন, বাবা, তুমি আমার চেয়ে ভোলানাথবাবুর উপর বেশি আস্থা রাখছি, বোধহয় তার পরিবারিক ইতিহাসটা ভুলে যাচ্ছ। ভোলানাথবাবুর বাবা খাজনা দিতে দেরি করায় দুর্লভ মল্লিকের লোক গিয়ে তাঁর ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। আর-

মূর্খ! মল্লিকমশাই দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠলেন।ভোলানাথ তখন ছিল শিশু। ঘটনার যাট বছরে সে প্রতিশোধ নেবে। আমাকে হত্যা করে? এমন কথা শুনলে লোকে হাসবে সেটা বুঝতে পারছি না?

আমরা আর বসলাম না; চলুন, আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসি, বাইরে এসে বললেন জীবনবাবু।আপনারা শর্টকাট চিনে ফিরতে পারবেন না।

ফটিক থেকে বেরিয়ে এসে ভদ্রলোক বললেন, আপনাকে ডেকে এনে আমি ঝামেলার মধ্যে ফেলতে চাইনি। আপনাকে যে-ভাবে অপমানিত হতে হল তার জন্য আমি অত্যন্ত লজ্জিত!

গোয়েন্দাদের এ সব ব্যাপারে লজ্জাবোধ থাকে না জীবনবাবু, বলল ফেলুদা।এখানে এসে আমার আদৌ আপশোঁস হচ্ছে না। এ নিয়ে আপনি চিন্তাই করবেন না। আমার কেবল আপনার সম্বন্ধেই ভাবনা হচ্ছে। একটা কথা আপনার বোঝা উচিত; হুমকি চিঠি পড়ে ভোলানাথবাবুর কথা মনে হচ্ছে বলেই কিন্তু সন্দেহটা আরও বেশি করে আপনার উপর পড়ছে।

কিন্তু গামছা আর চিঠি যখন আসে তখন তো আমি কলকাতায়, মিস্টার মিত্তির।

ফেলুদা একটা ছোট্ট হাসি দিয়ে বলল, আপনার যে কোনও অনুচর নেই গোসাঁইপুরে সেটা কী করে জানব জীবনবাবু?

আপনিও আমাকে সন্দেহ করছেন? শুকনো ধরা গলায় প্রশ্ন করলেন জীবনবাবু।

আমি এখনও কাউকেই সন্দেহ করছি না, কাউকেই নিদোষ ভাবছি না। তবে একটা কথা আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই। ভোলানাথবাবু কীরকম লোক?

জীবনবাবু এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, অত্যন্ত বিশ্বস্ত। এটা স্বীকার না করে উপায় নেই। কিন্তু তাই বলেই কি আমার উপর সন্দেহ পড়বে? শেষ প্রশ্নটা মরিয়া হয়ে করলেন জীবনবাবু। ফেলুদা বলল, জীবনবাবু, এখন আমাকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে সমস্ত ব্যাপারটা দেখতে হবে। এ ছাড়া উপায় নেই। এবং আপনাকে ধৈর্য ধরতে হবে। এ ছাড়া আপনারও উপায় নেই। অপরাধীকে রক্ষা করার রাস্তা আমার জানা নেই। কিন্তু যে নিদোষ তাকে আমি বাঁচাবই।

এতে জীবনবাবু আশ্বস্ত হলেন কি না সেটা অন্ধকারে তাঁর মুখ না দেখে বোঝা গেল না।

বাঁশবনটা ফুরিয়ে আসার মুখে ফেলুদা একটা প্রশ্ন করল জীবনবাবুকে।

আপনার বাবা তো খড়ম ব্যবহার করেন; খালি পায়ে হাঁটাহাঁটি করেন কি কখনও—বাড়ির বাইরে?

বাড়ির ভিতরেই করেন না কখনও, তো বাড়ির বাইরে!! এটা অবিশ্যি নতুন কিছু নয়। চিরকালের ব্যাপার।

পায়ের তলায় যেন মাটি দেখলাম। তাই জিজ্ঞেস করছি। আর একটা কথা—উনি। মশারি ব্যবহার করেন না?

নিশ্চয়ই। এখানে সবাই করে। করতেই হয়। কেন বলুন তো?

আপনি বোধহয় ল্যাম্পের আলোয় ঠিক বুঝতে পারেননি; ওঁর সবঙ্গে অসংখ্য মশার কামড়ের চিহ্ন।

তাই বুঝি? বুঝলাম জীবনবাবু খেয়াল করেননি। সত্যি বলতে কী আমিও করিনি। কিন্তু বাবা তো মশারি ব্যবহার করেন। মশারি তো সাহেবদের জিনিস না, ওতে আপত্তির কী আছে?

তা হলে বোধহয় ফুটো আছে। একটু দেখবেন তো।

৩. তুলসীবাবু আর জটায়ু

তুলসীবাবু আর জটায়ু আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন; এতক্ষণে ইলেকট্রিক লাইটে এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। লালমোহনবাবু বললেন, ভাবতে পারেন, এই গণ্ডগ্রামে প্রায় বিশ জনের মতো লোক পাওয়া গেল। যারা আমার ফিফটি পারসেন্টের বেশি বই পড়েচে? অবিশ্যি সবাই যে কিনে পড়েচে তা নয়; সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট ইস্কুলের লাইব্রেরি থেকে নিয়ে পড়েচে। যারা কিনোচে তারা এসে বইয়ে সই নিয়ে গেল।

তুলসীবাবু ফেলুদাকে বললেন, আপনার অপেক্ষাতেই বসে আছি। একবার আত্মারামের দর্শনটা করে নিন। বাদুড়েকালী না হয় কাল দেখা যাবে।

সেটা আবার কী?

গোসাঁইপুরের আরেকটি অ্যাট্রাকশন। আপনারা যে বাঁশবন দিয়ে এলেন, তারই ভেতরে একটি দুশো বছরের পুরনো পোড়ো মন্দির। বিগ্রহ নেই। বহুদিন থেকেই বাদুড়ের বাসা হয়ে পড়ে আছে। এককালে খুব জাঁকের মন্দির ছিল।

ভাল কথা, আপনার এই আত্মারামবাবুট এ-গাঁয়েরই লোক?

না, তবে রয়েছেন। এখানে অনেক'দিন। বছর দুয়েক হল ভদ্রলোকের এই ক্ষমতা প্রকাশ পায়। তা ছাড়া জ্যোতিষও জানেন। খুব নাম-ডাক। কলকাতা থেকে লোক এসে হাত-টাত দেখিয়ে যায়।

পয়সা নেন?

তা হয়তো নেন। কিন্তু এখানের কারুর কাছ থেকে কোনওদিন কিছু নিয়েছেন বলে শুনিনি। আত্মা নামান সোম আর শুকুরে; আজ শুধু দর্শনটা করিয়ে আনব।

ফেলুদা দর্শনের ব্যাপারে দেখলাম কোনও আপত্তি করল না। কারণ পরিষ্কার : সে বুঝেছে মৃগেন ভট্যচায এখন তদন্তের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

বাইরে গাছপালার ফাঁক দিয়ে এবাড়ি-ওবাড়ির বিজলি-আলো দেখা গেলেও অন্ধকারটা বেশ জমজমাট। চাঁদ এখনও ওঠেনি। বিপ্লবিষ্ণু প্যাঁচ শেয়াল সব মিলিয়ে মনে হচ্ছিল এখানে শ্যাম মল্লিকের পালকি আর কেরোসিন ল্যাম্পই মানায় বেশি। লালমোহনবাবু বললেন এর চেয়ে রহস্যময় আর রোমাঞ্চকর পরিবেশ তিনি আর দেখেননি। বললেন, যে- উপন্যাসটার ছক কেটেচি সেটা গোয়াটেমালায় ফেলব ভাবচিলুম, এখন দেখাচ গোসাঁইপুর প্রেফারেবল।

তাও তো ঠগীর ফাঁসটা দেখেননি, তা হলে বুঝতেন রোমাঞ্চ কাকে বলে।

সে কী ব্যাপার মশাই?

ফেলুদা সংক্ষেপে ঘটনাটা বলল। হুমকি চিঠির কথাটাও বলল। তুলসীবাবু মন্তব্য করলেন,মৃগেন ভটচায। যদি আত্মা আনিয়ে ওই কথাই বলে থাকে যে মল্লিক বাড়িতেই রয়েছেন শ্যাম মল্লিকের শত্রু তা হলে সেটা মানতেই হবে। আপনার সারা গাঁ চষে বেড়ানোর দরকার নেই।

আমি মনে মনে বললাম—তুলসীবাবুর ভক্তির পাত্রের মধ্যে আরেকজন লোক পাওয়া গেল—আত্মারাম মৃগেন ভট্টাচার্য।

মৃগেনবাবুর বাড়িতেও দেখলাম ইলেকট্রিসিটি নেই। বোধহয় আবছা আলোয় আত্মা সহজে নামে তাই। ভদ্রলোকের চেহারাটা বেশ চোখে পড়ার মতো। দেখে বয়স বোঝার উপায় নেই। পাতলা চুলে পাক ধরেনি, যদিও চোখের কোলে আর থুতনির নীচে চামড়া কুঁচকে গেছে। নাক, চোখ, কপাল, পাতলা ঠোঁট, গায়ের রং সবই একেবারে কাশির টালের পণ্ডিতের মতো। মানে যাকে বলে মার্কা মারা বামুন। পায়ের গুলি দেখে মনে হল ভদ্রলোক এখন না হলেও এককালে প্রচুর হেঁটেছেন।

বিজলি না থাকলেও এখানে চেয়ার টেবিলের অভাব নেই। ভট্যচায মশাই নিজে তক্তপোষে বসে আছেন, সামনে তিনটি টিনের আর একটা কাঠের চেয়ার ছাড়া দুপাশে দুটো বেঞ্চ রয়েছে। ডান দিকের বেঞ্চিতে একজন বছর পচিশের ছেলে বসে একটা পুরনো পাঁজির পাতা উলটাচ্ছে। পরে জেনেছিলাম ও মৃগেনবাবুর ভাগনে নিত্যানন্দ, আত্মা নামানোর ব্যাপারে মামাকে সাহায্য করে।

তুলসীবাবু ভটচার্য মশাইকে টিপ করে একটা প্রণাম করে আমাদের দিকে দেখিয়ে বললেন, কলকাতা থেকে এলেন এরা। আমার বন্ধু। নিয়ে এলাম। আপনার কাছে। গোসাঁইপুর কাকে নিয়ে গর্ব করে সেটা এদের জানা উচিত নয় কি?

মৃগাঙ্কবাবু ঘাড় তুলে আমাদের দেখে চেয়ারের দিকে দেখিয়ে দিলেন। আমরা তিনজনে বসলাম, তুলসীবাবু দাঁড়িয়ে রইলেন।

মৃগাঙ্কবাবু হঠাৎ টান হয়ে পদ্মাসন করে বসে মিনিট খানেক চোখ বুজে। চুপ করে রইলেন। তারপর সেই অবস্থাতেই বললেন, সন্ধ্যাশশী বন্ধুটি কোন জন?

আমরা সবাই চুপ। ফেলুদার চোখ কুঁচকে গেছে। লালমোহনবাবু বললেন, আজ্ঞে ওই নামে তো কেউ—?

তুলসীবাবু ঠোঁটে আঙুল দিয়ে তাঁকে থামিয়ে দিলেন।

প্রদোষ চন্দ্র মিত্র আমার নাম, হঠাৎ বলে উঠল। ফেলুদা। সত্যিই তো!—প্রদোষ মানে সন্ধ্যা, চন্দ্র হল শশী, আর মিত্র হল বন্ধু!

ভটচায মশাই চোখ খুলে ফেলুদার দিকে মুখ ঘোরালেন। তুলসীবাবু দেখি বেশ গর্ব-গর্ব। ভাব করে ফেলুদার দিকে চেয়ে আছেন।

বুঝলে তুলসীচরণ, বললেন ভটচার্য মশাই।কিছুদিন পরে আর আত্মার প্রয়োজন হবে। না। আমার নিজের মধ্যেই ক্রমে ত্রিকাল দর্শনের শক্তি জাগছে বলে অনুভব হচ্ছে। অবিশ্যি আরও কয়েক বছর লাগবে।

ওঁর পেশাটা কী বলুন তো! তুলসীবাবু ফেলুদার দিকে দেখিয়ে প্রশ্নটা করলেন। ইতিমধ্যে একজন বাইরের লোক এসে ঢুকেছে, তার সামনে ফেলুদা যে গোয়েন্দা এই খবরটা বেরিয়ে পড়লে মোটেই ভাল হবে না।

সেটা আর বলার দরকার নেই, বলল ফেলুদা। তুলসীবাবুও নিজের অসাবধানতার ব্যাপারটা বুঝে ফেলে জিভা কেটে কথা ঘুরিয়ে বললেন, শুকুরবার আরেকবার আপনার এখানে নিয়ে আসবা ওঁদের। আজ কেবল দর্শনটা করিয়ে গেলাম।

মৃগাঙ্কবাবুর চোখ এখনও ফেলুদার দিকে। একটু হেসে বললেন, সূক্ষ্ম সাল শস্যের কাজে এসেছেন। আপনি, এ কথা বললে আপনি ছাড়া আর কেউ বুঝবে কি? আপনি অকারণে বিচলিত হচ্ছেন।

ভদ্রলোকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাইরে এসে ফেলুদা বলল, চতুর লোক। এর পাসার জামবে না তো কার জমবে?

সূক্ষ্ম সাল শস্য কী মশাই? লালমোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন। সন্ধ্যা শশী বন্ধু তো তাও অনেক কষ্টে বুঝলাম–তাও আপনি নিজের নামটা বললেন বলে।

সূক্ষ্ম হল অণু, সাল-দন্ত্য সা-হল সন, আর শস্য হল ধান। তিনে মিলে–

অনুসন্ধান! লালমোহনবাবু ক্ল্যাপ দিয়ে বলে উঠলেন, লোকটা শুধু গণনা জানে না, হেঁয়ালিও জানে। আশ্চর্য!

কে যেন এদিকেই আসছে-হাতের লণ্ঠনটা দোলার ফলে তার নিজের ছায়াটা সারা রাস্তা ঝাঁট দিতে দিতে এগিয়ে আসছে; তুলসীবাবু হাতের টর্চ তুলে তার মুখে ফেলে বললেন, ভট্টচাযের ওখানে বুঝি? কী ব্যাপার, ঘন ঘন দর্শন?

ভদ্রলোক একটু হেঁ হেঁ ভাব করে কিছু না বলে আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন।

ভোলানাথবাবু বললেন তুলসীবাবু, ভটচার্য মশাইয়ের লেটেস্ট ভক্ত। মাঝে এক'দিন ওঁর বাড়িতে গিয়ে কার জানি আত্মা নামিয়েছেন।

রাত্রে তুলসীবাবুর দাওয়ায় বসে তিনরকম তরকারি, মুগের ডাল আর ডিমের ডালনা দিয়ে দিব্যি ভোজ হল। তুলসীবাবু বললেন যে এখানকার টিউবওয়েলের জলটায় নাকি খুব খিদে হয়।

খাওয়া-দাওয়া করে বাইরের দাওয়ায় বসে তুলসীবাবুর কাছে ওঁর মাস্টারি জীবনের গল্প শুনে যখন দোতলায় শুতে এলাম। তখন ঘড়ি বলছে সাড়ে নটা, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন মাঝরাত্তির। আমরা মশারি সমেত বিছানাপত্র সব নিয়ে এসেছিলাম; ফেলুদা বলল ওডোমস মেখে শোব, মশারির দরকার নেই। আমি লক্ষ করেছি। গত দেড় ঘণ্টায় ও একবার কেবল গঙ্গার রান্নার প্রশংসা ছাড়া আর কোনও কথা বলেনি। এত চট করে ওকে চিন্তায় ডুবে যেতে এর আগে কখনও দেখিনি। লালমোহনবাবু বললেন ওঁর সংবর্ধনার স্পিচটা তৈরি করে রাখতে হবে, তাই উনি একটা লণ্ঠন চেয়েছেন, কারণ ঘরে বাতি জ্বলিয়ে রাখলে আমাদের ঘুমের ব্যাঘাত হবে।

আমি বিছানায় শুয়ে ফেলুদাকে একটা প্রশ্ন না করে পারলাম না।

তোমার নাম আর পেশ কী করে বলে দিল বলো তো?

আমার মনের অনেকগুলো প্রশ্নের মধ্যে ওটাও একটা রে তোপ্‌সে। তবে অনেক লোকের অনেক পিকিউলার ক্ষমতা থাকে যার কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

লালমোহনবাবু বললেন, আমাকে এভাবে স্রেফ ইগনোর করল কেন বলুন তো।

সারা গাঁয়ের লোক আপনাকে অভ্যর্থনা দিতে চলেছে, আর একটি লোক আপনার নামে হেঁয়ালি বাঁধল না বলে আপনি মুষড়ে পড়লেন?

তা হলে বোধহয় আমার নাম থেকে হেঁয়ালি হয় না তাই।

ফেলুদা দুটো ধোঁয়ার রিং ছেড়ে বলল, রক্তকরণ মুগ্ধকরণ নদীপাশে যাহা বিঁধিলে

মরণ-কেমন হল?

কীরকম, কীরকম? বলে উঠলেন লালমোহনবাবু। ফেলুদা এত ফস করে ছড়াটা বলেছে যে দুজনের কেউই ঠিকমত ধরতে পারিনি। ফেলুদা আবার বলল-রক্তবরণ মুগ্ধকরণ নদীপাশে যাহা বিঁধিলে মরণ।

দাঁড়ান, দাঁড়ান...রক্তবরণ লাল, আর মুগ্ধকরণ-

মোহন! আমি চেঁচিয়ে বলে উঠলাম।

ইয়েস, লালমোহন-কিন্তু গাঙ্গুলী?-ওহা, নদী হল গাঙ আর গুলি বিধিলে মরণ-ওঃ, ব্রিলিয়ান্ট মশাই! কী করে যে আপনার মাথায় এত আসে জানি না! আপনি থাকতে সংবর্ধনাটা আমাকে দেওয়ার কোনও মানেই হয় না। ভাল কথা, স্পিচটা তৈরি হলে একটু দেখে দেবেন তো?

৪. গ্রামটা ঘুরে দেখে

পরদিন সকালে গ্রামটা ঘুরে দেখে আমরা জাগরণী ক্লাবের বাড়িতে সিরাজদ্দৌলা নাটকের রিহার্শাল দেখতে গেলাম; ফেলুদা অভিনেতাদের সঙ্গে আলাপ করে তাদের ক্যানেডিয়ান থিয়েটার সম্বন্ধে একটা ছোটখাটো বক্তৃতা দিয়ে ফেলল। সেখানেই আলাপ হল গোসাঁইপুরের একমাত্র মূকাভিনেতা বেণীমাধবের সঙ্গে। বললেন শুকুরবার বিকেলে আমাদের বাড়িতে এসে তাঁর আর্ট দেখিয়ে যাবেন! দেখবেন স্যার, ফ্ল্যাট ছাতের উপর সিঁড়ি বেয়ে ওঠা দেখিয়ে দেব, ঝড়ের মধ্যে মানুষের অভিব্যক্তি কীরকম হয়, স্যাড় থেকে ছরকম চেঞ্জের মধ্যে দিয়ে হ্যাঁপিতে নিয়ে যাওয়া সব দেখিয়ে দেব।

বিকেলে সেগুনহাটির মেলা দেখতে গেলাম। সেখানে নাগরদোলায় চড়ে, চা চিকেন কাটলেট আর রাজভোগ খেয়ে স্পাইডার লেডির বীভৎস ভেলকি দেখে, সাড়ে তেরো টাকার খুচরো জিনিস কিনে গোসাঁইপুর যখন ফিরলাম তখন ছটা বাজে। আকাশে আলো আছে দেখেই বোধহয় ফেলুদা বলল একবার মল্লিকবাড়িতে জীবনবাবুর সঙ্গে দেখা করে যাবে। তুলসীবাবু বললেন বাড়ি গিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করবেন।

সদর দরজায় পৌঁছানোর আগেই জীবনবাবু বেরিয়ে এলেন; বললেন ওঁর ঘরের জানালা দিয়েই অনেক আগেই আমাদের দেখতে পেয়েছেন। তারপর ফেলুদার প্রশ্নের উত্তরে বললেন যে নতুন কোনও খবর নেই।আপনাদের বাগানটা একটু দেখতে পারি? নিশ্চয়ই, বললেন জীবনবাবু, আসুন আমার সঙ্গে।

বাগানটা অবিশ্যি ফুলের বাগান নয়, এখানে বেশির ভাগই বড় বড় গাছ আর ফলের গাছ। ফেলুদা ঘুরে ঘুরে কী দেখছে তা ওই জানে! একবার এক জায়গায় থেমে মাটিটার দিকে যেন একটু বেশিক্ষণ ধরে দেখল। এরই ফাঁকে আবার মল্লিকবাড়ির দোতলার পিছনের বারান্দা থেকে কে রে, কে ওখানে? বলে জীবনবাবুর ঠাকুমা চেঁচিয়ে উঠলেন। তাতে

জীবনবাবুকে আবার উলটে চেঁচিয়ে বলতে হল, কেউ না ঠাকুমা-আমরা। ও, তোরা, উত্তর দিলেন ঠাকুম, আমি রোজই যেন দেখি কারা ঘুরঘুর করে ওখানে।

আপনার ঠাকুমার দৃষ্টিশক্তি কেমন? জিজ্ঞেস করল ফেলুদা।

খুবই কম, বললেন জীবনবাবু, এবং তার সঙ্গে মানানসই শ্রবণশক্তি!

বাগান এমনিতে তেমন দেখাশোনা হয় না?

ওই ভোলানাথবাবুই যা দেখেন।

রাত্রে লোক থাকে। এদিকে?

রাত্রে? মাথা খারাপ! রাত জেগে বাগানে টহল দেবে এরা?

সদর দরজায় তালা দেওয়া থাকে আশা করি?

ওটা ভোলানাথবাবুর ডিউটি! তবে আমি থাকলে আমিই চাবি বন্ধ করি, চাবি আমার কাছেই থাকে।

ভোলানাথবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়নি; তাঁকে একবার ডাকতে পারেন!

ভোলানাথবাবুকে দিনের আলোয় দেখে মনে হল তিনি শহুরে লোকের মতো ধুতি শার্ট পরলেও তাঁর চেহারায় এখনও অনেকখানি তাঁর পূর্বপুরুষের ছাপ রয়ে গেছে। খালি গা করে মাঠে নিয়ে, হাতে লাঙল ধরিয়ে দিলে খুব বেমানান হবে না। আমরা বাড়ির সামনে বাঁধানো পুকুরের ঘাটে বসে কথা বললাম। বর্ষার জলে পুকুর প্রায় কানায় কানায় ভরে আছে আর সারা পুকুর ছেয়ে আছে। শালুকে। নবীন বলে একটি চাকরকে লেবুর সরবত আনতে বললেন জীবনবাবু! চারিদিক অদ্ভুত রকম নিস্তব্ধ, কেবল দূরে কেখেকে জানি চি চি করে শোনা যাচ্ছে ট্রানজিস্টারে গান। ওটা না হলে সত্যিই যেন মনে হত আমরা কোন আদ্যিকালে ফিরে গেছি।

মৃগাঙ্কবাবু আপনাদের বাড়িতে একবারই এসেছেন? ভোলানাথবাবুকে জিজ্ঞেস করল ফেলুদা।

সম্প্রতি একবারই এসেছেন।

আমার আগে?

আগেও এসেছেন। কয়েকবার। কাটোয়া থেকে আষাঢ় মাসে মদন গোসাঁইর দল এল, তখন মৃগাঙ্কবাবুই তাদের নিয়ে এসে কর্তাকে কোত্তন শুনিয়ে যান। এমনিতেও বার কয়েক একা আসতে দেখেছি; মনে হয়। কিন্তর্গ একটা কুষ্ঠি ছকে দেবার কথা বলেছিলেন।

সে কুষ্ঠি হয়েছে?

আজ্ঞে তা বলতে পারব না।

এবার যে এলেন, তার ব্যবস্থা কে করল?

আজ্ঞে কর্তার নিজেরই ইচ্ছা ছিল, আর কবিরেজ মশাইও বললেন, আর-আজ্ঞে, আমিও বলেছিলাম।

আপনার তো যাতায়াত আছে ভটচায বাড়িতে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ভক্তি হয়?

ভোলানাথবাবুর মাথা হেঁট হয়ে গেল। আজ্ঞে কী আর বলব বলুন। আমার মেয়ের নাম ছিল লক্ষ্মী, যেমন নাম তেমনি মেয়ে, এগারোয় পড়তে না পড়তে ওলাউঠোয় চলে গেল। মৃগাঙ্কবাবু শুনে বললেন, সে কেমন আছে জানতে চাও তার নিজের কথায়?

ভোলানাথবাবু অন্ধকারে ধুতির খুঁটে চোখ মুছলেন। তারপর সামলে নিয়ে বললেন, সেই মেয়েকে নামিয়ে আনলেন ভট্টচায মশাই! মেয়ে বললে ভগবানের কোলে সে সুখে আছে, তার কোনও কষ্ট নাই! মুখে বললে না। অবিশ্যি, কাগজে লেখা হল। সেই থেকে...

ভোলানাথবাবুর গলা আবার ধরে গেল। ফেলুদা ব্যাপারটাকে আর না বাড়িয়ে বলল, এ বাড়িতে আত্মা নামানোর সময় আপনি ছিলেন?

ছিলাম, তবে ঘরের মধ্যে ছিলাম না, দরজার বাইরে। ভেতরে কেবল কতামশাই আর ভটচায মশাই আর নিত্যানন্দ ছাড়া কেউ ছিলেন না। মা ঠাকরুন যেন জানতে না পারেন। এইটে বলে দিয়েছিলেন কর্তামশাই, তাই দরজায় পাহারা থাকতে হল।

তা হলে আপনি কিছুই শোনেননি?

আজ্ঞে দশ মিনিট খানেক চুপচাপের পর মধু সরকারের বাঁশ বনের দিক থেকে যখন শেয়াল ডেকে উঠল। সেই সময় যেন কতামশাইয়ের গলায় শুনলাম।-কেউ এলেন, কেউ এলেন? তারপর আর কিছু শুনিনি। সব হয়ে যাবার পর ভটচার্য মশাইকে নিয়ে তাঁর বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।

সরবত খাওয়া শেষ করে একটা চারমিনার ধরিয়ে ফেলুদা বলল, দুর্লভ মল্লিকের লোক আপনাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল সে কথা মনে পড়ে?

ভোলানাথবাবুর উত্তর এল ছোট্ট দুটো কথায়।

তা পড়ে।

আপনার মনে আক্রোশ নেই?

ফেলুদাকে এ ধরনের ধাক্কা-মারা প্রশ্ন করতে আগেও দেখেছি। ও বলে এই ধরনের প্রশ্নের রিঅ্যাকশন থেকে নাকি অনেক কিছু জানা যায়। ভোলানাথবাবু জিভ কেটে মাথা হেঁট

করলেন। তারপর কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে বললেন, এখন মাথাটা ঠিক নেই। তাই, নইলে কতার্মশাইয়ের মতো মানুষ কজন হয়?

ফেলুদা আর কোনও প্রশ্ন করল না। ভোলানাথবাবু একটুক্ষণ অপেক্ষা করে বললেন, যদি অনুমতি দেন-আমি একটু ভটচার্য মশাইয়ের বাড়ি যাব।

ফেলুদা বা জীবনবাবুর কোনও আপত্তি নেই জেনে ভদ্রলোক চলে গেলেন। জীবনবাবু একটু উস্‌খুস্‌ করছেন দেখে ফেলুদা বলল, কিছু বলবেন কি?

আপনি কিছুটা অগ্রসর হলেন কি না জানার আগ্রহ হচ্ছে।

বুঝলাম ভদ্রলোক নিজের সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তিত।

ফেলুদা বলল, ভোলানাথবাবুকে বেশ ভাল লাগল।

জীবনবাবুর মুখ শুকিয়ে গেল। তার মানে আপনি বলতে চান–

আমি নিশ্চয়ই বলতে চাই না আপনাকে আমার ভাল লাগে না। আমি বলতে চাই শুধু দু-একটা খটকার উপর নির্ভর করে তো খুব বেশি দূর এগোনো যায় না-বিশেষ করে সেই খটকাগুলোর সঙ্গে যখন মূল ব্যাপারটার কোনও সম্পর্ক পাওয়া যাচ্ছে না। এখন যেটা দরকার সেটা হল কোনও একটা ঘটনা যেটা–

কে রে, কে ওখানে?

ফেলুদার কথা থেমে গেল, কারণ ঠাকুমা চেঁচিয়ে উঠেছেন। আওয়াজটা এসেছে বাড়ির পিছন দিক থেকে। চারদিক নিস্তব্ধ বলে গলা এত পরিষ্কার শোনা গেল।

ফেলুদা দেখলাম মুহূর্তের মধ্যে সোজা বাগানের দিকে ছুটছে। আমরাও তার পিছু নিলাম; লালমোহনবাবু এতক্ষণ পুকুরের দিকে তাকিয়ে গুনগুন করে গান গাইছিলেন। তিনিও দেখলাম সঙ্গে সঙ্গে দিলেন ছুট।

তিনটে টর্চের আলোর সাহায্যে আমরা বাগানে গিয়ে পৌঁছলাম! ফেলুদা এগিয়ে গেছে, সে পশ্চিমের পাঁচিলের গায়ে একটা ধসে যাওয়া অংশের পাশে দাঁড়িয়ে বাইরে টর্চ ফেলে রয়েছে।কাউকে দেখলেন? জীবনবাবু প্রশ্ন করলেন।

দেখলাম, কিন্তু চেনার মতো স্পষ্ট নয়।

আধঘণ্টা ধরে মশার বিনবিনুনি আর কামড় আর বিঝির কান ফাটানো শব্দের মধ্যে সারা বাগান চষে যেটা পাওয়া গেল সেটা একটা চরম রহস্য। সেটা হল বাগানের উত্তর দিকের শেষ মাথায় একটা গাছের গুড়ির পাশে একটা সদখোঁড়া গর্ত। তার মধ্যে যে কী ছিল বা কী থাকতে পারে সে ব্যাপারে জীবনবাবু কোনওরকম আলোকপাত করতে পারলেন না। লালমোহনবাবু অবিশ্যি সোজাসুজি বললেন গুপ্তধন, কিন্তু জীবনবাবু বললেন তাঁদের বংশে কস্মিনকালেও গুপ্তধন সম্বন্ধে কোনও কিংবদন্তি ছিল না। ফেলুদা যে কথাটা বলল সেটাও আমার কাছে পুরোপুরি রহস্য।

জীবনবাবু, আমার মনে হচ্ছে আমরা এই ঘটনাটার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

আমরা কিছুক্ষণ হল খাওয়া-দাওয়া সেরে আমাদের ঘরে এসে বসেছি। আজ বেশ কাহিল। লাগছে; বুঝতে পারছি। অন্ধকারে বনবাদাড়ে ঘোরাটা সহজ কাজ নয়। আমার আর লালমোহনবাবুর পায়ে বেশ কয়েক জায়গায় ডেটল দিতে হয়েছে। কারণ আগাছার মধ্যে কাঁটা-ঝোপও ছিল বেশ কয়েকটা।

একমাত্র ফেলুদাকে দেখে মনে হচ্ছে তার মধ্যে কোনও পরিবর্তন নেই। সে আজ তার খাতা খুলেছে। গায়ে ওডোমস লাগিয়ে বালিশে বুক দিয়ে শুয়ে কী যেন হিজিবিজি লিখছে। লালমোহনবাবু একটা হাই অর্ধেক তুলে থেমে গেলেন, কারণ ফেলুদা একটা প্রশ্ন করেছে—লালমোহনবাবুকে নয়, তুলসীবাবুকে। তুলসীবাবু আমাদের জন্য পান নিয়ে ঢুকছেন।

তুলসীবাবু, আপনি যদি একজন মহৎ লোককে একটা লোক ঠকানো ফন্দি বাতলে দেন, সে-লোক যদি সে ফন্দি কাজে লাগায়, তা হলে তাকে কি আর মহৎ বলা চলে?

তুলসীবাবু ভ্যাবাচ্যাক ভাব করে বললেন, ওরে বাবা, আমি মশাই এসব হেঁয়ালি-টেয়ালিতে একেবারেই অপটু। তবে হ্যাঁ, মহৎ লোক অত নীচে নামবেন কেন? নিশ্চয়ই নামবেন না।

যাক, বলল ফেলুদা, আমি খুশি হলাম জেনে যে আপনি আমার সঙ্গে এক মত।

একেই তো প্যাঁচালো রহস্য, সেটাকে ধোঁয়াটে কথা বলে ফেলুদা আরও পেচিয়ে দিচ্ছে, আমি তাই ও নিয়ে আর একদম চিন্তা না করে মশারির ভিতর ঢুকলাম। কিন্তু চিন্তা করব না। ভাবলেই কি আর মন থেকে চিন্তা পালিয়ে যায়? আমার নিজের, মনেই যে প্রশ্ন জমা হয়েছে একগাদা। শ্যামলালবাবুর পায়ে কাদা কেন? কে পাঠিয়েছে ঠগীর ফাঁস আর হুমকি চিঠি? ঠাকুমা কাকে দেখে চেঁচালেন আজকে? বাগানের গর্তে কী ছিল? আত্মার উত্তর লেখা কাগজ দেখালেন না কেন মল্লিকমশাই?...গতকালের মতো আজও বিছানায় পড়তে না পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কেবল তফাতটা এই যে গতকাল এক ঘুমে রাত কাবার, আর আজ চোখ খুলে দেখি তখনও অন্ধকার।

আসলে ঘুমটা ভেঙেছে একটা চিৎকারে। সেটার জন্য দায়ী বোধহয় লালমোহনবাবু, কারণ তিনি খাটের উপর বসে আছেন মশারির বাইরে, সামনের খোলা জানালার গরাদের ভিতর দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে তাঁর মুখের উপর, আর স্পষ্ট দেখছি তাঁর চোখ গোল হয়ে গেছে।

বাপুরে বাপ, কী স্বপ্ন, কী স্বপ্ন! বললেন লালমোহনবাবু।

কী দেখলেন আবার? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

দেখলুম। আমার ঠাকুরদা। হরিমোহন গাঙ্গুলীকে.একটা সংবর্ধনা সভা, তাতে ঠাকুরদা। স্পিচ দিলেন, তারপর আমার গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে বললেন, এই দ্যাখ, কেমন রোমাঞ্চকর মালা দিলাম তোকে—আর আমি দেখছি সেটা ফুলের মালা নয় তপেশ, সেটা—ওরেব্বাসরে বাস্-সেটা খুদে খুদে রক্তবর্ণ নরমুণ্ড দিয়ে গাঁথা!

এমন চমৎকার ব্রাহ্ম মুহূর্তে আপনি এই সব উদ্ভট স্বপ্ন দেখছেন?

আশ্চর্য! ফেলুদা যে তার খাটে নেই সেটা এতক্ষণ খেয়ালই করিনি। সে ছাতের দরজা দিয়ে ঘরে এসে ঢুকলা; বুঝলাম সে যোগব্যায়াম করছিল। যাক, তা হলে সকাল হয়ে গেছে।

কী করব বলুন, বললেন লালমোহনবাবু, আপনার ওই রক্তকরণ আর আত্মারাম আর সংবর্ধনা মিলে এমন জগাখিচুড়ি হয়ে গেছে আমার মধ্যে।

আমরা উঠে পড়লাম; তুলসীবাবু কি এখনও ঘুমোচ্ছেন? ছাতে এসে দেখি পুব দিকটা সবে ফরসা হয়েছে, তার ফলে চাঁদের আলোটা ফিকে লাগছে। দু-তিনটে তারা এখনও পিট্-পিটু করছে, কিন্তু তাদের মেয়াদও আর বেশিক্ষণ নয়। দাঁতন দিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করব বলে কিছু নিমের ডাল ভেঙে রেখেছিলাম-ফেলুদা বলে দোকানের যে কোনও টুথব্রাশ আর পেস্টের চেয়ে দশ গুণ বেশি ভাল—তারই একটা চিবিয়ে রেডি করছি, এমন সময় শুনলাম পরিত্রাহি চিৎকার।

মিত্তির মশাই! মিত্তির মশাই!

ভোলানাথবাবুর গলা। আমরা দুদ্দাড় করে নীচে গিয়ে হাজির হলাম। সর্বনাশ হয়ে গেছে!

ভোরের আকাশে ভদ্রলোকের ফ্যাকাসে মুখ আরও ফ্যাকাশে লাগছিল। কী হয়েছে? ফেলুদা দৌড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল।

কাল রাত্তিরে বাড়িতে ডাকাত পড়ে সব লণ্ডভণ্ড। সিন্দুক খালি! কতমশাইয়ের হাত-পা-মুখ বেঁধে রেখেছিল। আমাকেও বেঁধেছিল, সকালে ছোটবাবু এসে খুলে দিলেন। আপনি শিগগির আসুন!

৫. শ্যামলাল মল্লিক জখম হননি বটে

শ্যামলাল মল্লিক জখম হননি বটে, কিন্তু তাঁকে যেভাবে দুঘণ্টা বাঁধা অবস্থায় পড়ে থাকতে হয়েছিল তাতে তিনি বেশ, টসকে গেছেন। ফ্যালফ্যাল করে সামনের দিকে চেয়ে বসে আছেন ফরাসের উপর, কেবল একবার মাত্র বিড়বিড় করে বলতে শুনলাম, বাঁধলি যদি তো মেরে ফেললি না কেন? এদিকে তাঁর সিন্দুক যে ফাঁক সেটা কি তিনি খেয়াল করেছেন?

ফেলুদা প্রথমে শ্যামলালবাবুর ঘরটা তন্ন তন্ন করে দেখল। শুধু সিন্দুকটাই খোলা হয়েছে, আর যার যেমন তেমনিই আছে। চাবি থাকত নাকি ভদ্রলোকের বালিশের নীচে। ভোলানাথবাবু দোতলাতেই শোন, তাঁকে ঘুমের মধ্যে অ্যাটাক করে হাত-পা চোখ-মুখ বেঁধে ফেলেছে ডাকাত। ওঁর ধারণা যে অন্তত দুজন লোক ছিল। চাকর নবীন নাকি সারারাত নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়েছে। দুজন পাইকের মধ্যে একজন চলে গিয়েছিল সেগুনহাটি যাত্রা দেখতে, আর একজন তার ডিউটি ঠিকই করছিল, দুঃখের বিষয় ডাকাত মাথায় লাঠি মেরে বেশ কয়েক ঘণ্টার জন্য তাকে অকেজো করে দিয়েছিল। সামনের দরজা বন্ধই ছিল, কাজেই মনে হয় খিড়কির পাঁচিল টপকে পিছনের বারান্দা দিয়ে ঢুকেছিল। ঠাকুমাকে কিছু জিজ্ঞেস করে লাভ নেই, কারণ তিনি থাকেন বারান্দার উত্তর প্রান্তে তিনটে অকেজো ঘরের পরে শেষ ঘরে।

পনেরো মিনিট হল এসেছি, কিন্তু এখনও জীবনবাবুর দেখা নেই। ভোলানাথবাবু আমাদের সঙ্গেই ছিলেন, ফেলুদা তাঁকে বলল, জীবনবাবু কি আমাদের সঙ্গে কথা না বলেই পুলিশে খবর দিতে গেলেন নাকি?

ভোলানাথবাবু আমতা আমতা করে মাথা নেড়ে বললেন, আজ্ঞে আমাকে বলেই তিনি বাইরে বেরিয়ে ছিলেন বটে, কিন্তু তার পরে তো...

ফেলুদা এবার ছুটিল সিঁড়ির দিকে, পিছনে আমি আর লালমোহনবাবু। উঠোন পেরিয়ে সোজা খিড়কি দিয়ে বাইরে বাগানে হাজির হলাম। এখনও ভাল করে সূর্য ওঠেনি। অল্প কুয়াশাও যেন রয়েছে, কিংবা জমে থাকা উনুনের ধোঁয়া। গাছের পাতাগুলো শিশিরে ভেজা, পায়ের নীচে ঘাস ভেজা। পাখি ডাকছে-কাক, শালিক, আর আরেকটার নাম জানি না।

আমরা বাগানের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গিয়ে থমকে থেমে গোলাম।

দশ হাত দূরে একটা কাঁঠাল গাছের গুড়ির ধারে নীল পাঞ্জাবি আর পায়জামা পরা একজন লোক পড়ে আছে। ওই পোশাক আমি চিনি; ওই চটিটাও চিনি।

ফেলুদা এগিয়ে গিয়ে কাছ থেকে দেখেই একটা আতঙ্ক আর আক্ষেপ মেশানো শব্দ করে পিছিয়ে এল।

ও মশাই।

লালমোহনবাবু আঙুল দিয়ে কিছু দূরে মাটিতে একটা জায়গায় পয়েন্ট করে কথাটা বললেন।

জানি। দেখেছি, বলল ফেলুদা, ওটা ছোবেন না। ওটা দিয়েই জীবনবাবুকে খুন করা হয়েছে। ঝোপের ধারে পড়ে রয়েছে। কোণে পাথর বাঁধা একটা গামছা।

ভোলানাথবাবুও বেরিয়ে এসেছেন, আর দেখেই বুঝছেন কী হয়েছে। 'সর্বনাশ' বলে মাথায় হাত দিয়ে প্রায় যেন ভিরমি লাগার ভাব করে তিন হাত পেছিয়ে গেলেন ভদ্রলোক।

এখন বিচলিত হলে চলবে না ভোলানাথবাবু, আপনি চলে যান ভদ্রলোকের সঙ্গে। এখানে পুলিশের ঘাঁটিতে গিয়ে খবর দিন। দরকার হলে শহর থেকে দারোগা আসবে। কেউ যেন লাশ বা গামছা না ধরে। কিছুক্ষণ আগেই এ কীর্তিটা হয়েছে। সে লোক হয়তো এখনও এ তল্লাটেই আছে। আর—ভাল কথা—মল্লিকমশাই যেন খুনের কথাটা না জানেন।

ফেলুদা দৌড় দিল পশ্চিম দিকের পাঁচিল লক্ষ্য করে, সঙ্গে সঙ্গে আমিও।

এ দিকের পাঁচিলের একটা জায়গা ধসে গিয়ে দিব্যি বাইরে যাবার পথ হয়ে গেছে। আমরা দুজনে টপকে বাইরে গিয়ে পড়লাম। ফেলুদার চোখ চারিদিকে ঘুরছে, এমনকী জমির দিকেও। আমরা এগিয়ে গেলাম। একশো গজের মধ্যে অন্য কোনও বাড়ি নেই, কারণ এটা সেই শর্টকাটের বাঁশবন। কিন্তু ওটা কী? একটা ভাঙা মন্দির। নিশ্চয় সেই বাদুড়ে কালী মন্দির।

মন্দিরের পাশে একজন লোক, আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছেন। কবিরাজ রসিক চক্রবর্তী।কী ব্যাপার? এত সকালে? ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন।

আপনি খবর পাননি বোধহয়?

কী খবর?

মল্লিকমশাই–

অ্যাঁ! কবিরাজের চোখ কপালে উঠে গেছে।

আপনি যা ভয় পাচ্ছেন তা নয়। মল্লিকমশাই সুস্থই আছেন, তবে তাঁর বাড়িতে ডাকাত পড়েছে। আর জীবনবাবু খুন হয়েছেন–তবে এ খবরটা আর মল্লিকমশাইকে দেবেন না।

রসিকবাবু ব্যস্তভাবে এগিয়ে গেলেন। আমরাও ফেরার রাস্তা ধরলাম; খুনি পালিয়ে গেছে।

পাঁচিল টপকে বাগানে ঢুকে এগিয়ে যেতেই তিন নম্বর বিস্ফোরণ। আমার মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। একি স্বপ্ন না। সত্যি? কাঁঠাল গাছের নীচটা এখন খালি।

জীবনবাবুর লাশ উধাও।

ঝোপের পাশ থেকে ঠগীর ফাঁসটাও উধাও।

লালমোহনবাবু একটা গোলঞ্চ গাছের পাশে দাঁড়িয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছেন। কোনওরকমে ভদ্রলোক মুখ খুললেন।

ভোলানাথবাবু পুপ্র–পুলিশে খবর দিতে গেলেন, আমি আপনাদের খুঁজতে এসে দেখি...

এসে দেখলেন লাশ নেই? ফেলুদা চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল। না!

ফেলুদা আবার দৌড় দিল। এবার পশ্চিমে নয়, পুবে।

পুবের দেয়ালে ফাঁক নেই, কিন্তু উত্তরে আছে। কালকের সেই গর্ত–আজ দেখলাম সেটা একটা আম গাছের নীচ–আর পিছনেই ফাঁক। বড় ফাঁক, প্রায় একটা ফটক বললেই চলে। আমি আর ফেলুদা বাইরে বেরেলাম।

দশ হাতের মধ্যেই একটা পুকুর, জলে টুইটম্বর। এই পুকুরেই যে ফেলা হয়েছে লাশ তাতে সন্দেহ নেই।

আমরা ফিরে গিয়ে পিছনের সিঁড়ি দিয়ে সোজা উঠলাম দোতলায়।

ও জীবন, ও বাবা জীবন!–ঠাকুমা চেঁচাচ্ছেন–এই যেন দেখলাম জীবনকে, গোল কোথায় ছেলেটা?

গাল তোবড়ানো, চুল ছোট করে ছাঁটা, থান পরা আশি বছরের বুড়ি, ঘোলাটে চশমা পরে নিজের ঘর ছেড়ে বারান্দার এদিকে চলে এসেছেন। অ্যাদ্দিন গলা শুনেছি, আজ প্রথম দেখলাম ঠাকুমাকে। ফেলুদা এগিয়ে গেল।জীবনবাবু একটু বেরিয়েছেন। আমার নাম প্রদোষ মিত্র। আপনার কী দরকার আমাকে বলতে পারেন।

তুমি কে বাবা?

আমি জীবনবাবুর বন্ধু।

তোমাকে তো দেখিনি।

আমি দুদিন আগে এসেছি কলকাতা থেকে।

তুমিও কলকাতায় থাকো?

আজ্ঞে হ্যাঁ। কিছু বলার ছিল আপনার?

বুড়ি হঠাৎ যেন খেই হারিয়ে ফেললেন। ঘাড় উঁচু করে কিছুক্ষণ এদিক ওদিক চেয়ে বললেন, কী বলার ছিল সে আর মনে নেই বাবা, আমার বড্ড ভোলা মন যে!

আমরা ঠাকুমাকে আর সময় দিলাম না। তিনজনে গিয়ে ঢুকলাম শ্যামলালবাবুর ঘরে।

রসিকবাবু ইতিমধ্যে এসে হাজির হয়েছেন; তিনি শ্যামলালবাবুর নাড়ি ধরে বসে আছেন।

জীবন কোথায় গেল? এখনও কেমন জানি অসহায় ভাব করে কথা বলছেন ভদ্রলোক। বুঝলাম রসিকবাবু জীবনবাবুর মৃত্যু সংবাদটা শ্যামলালবাবুকে দেননি।

আপনি তো চাইছিলেন তিনি কলকাতায় ফিরে যান, বলল ফেলুদা।

ও চলে গেল! কীসে গেল? পালকিতে?

পালকিতে তো আর সবটুকু যাওয়া যায় না। কাটায়া থেকে ট্রেন ছাড়া গতি নেই। গোরুর গাড়ি বা ডাক গাড়িতে যাওয়া আজকের দিনে যে সম্ভব নয় সেটা নিশ্চয়ই বোঝেন।

তুমি আমাকে বিদ্যুপ করছ? শ্যামলালবাবুর গলায় যেন একটু অভিমানের সুর।

শুধু আমি কেন? ফেলুদা বলল, গ্রামের সবাই করে। আপনি যা করছেন তাতে আপনার তো নয়ই, কারুরই লাভ বা মঙ্গল হচ্ছে না। আপনার নিজের কী হল সেটা তো দেখলেন। সড়কির বদলে বন্দুকধারী একজন ভাল পাহারাদার থাকলে আর এ কাণ্ডটা হত। না।

বৈদ্যুতিক শক-এর চেয়ে এ শকটা কি কিছু কম হল? যে-যুগ চলে গেছে তাকে আর ফিরিয়ে আনা যায় না মল্লিকমশাই।

আশ্চর্য, আমি ভেবেছিলাম ভদ্রলোক তেলেবেগুনে জ্বলে উঠবেন, কিন্তু সেটা হল না।

ফেলুদার কথার উত্তরে একটি কথাও বললেন না। তিনি, কেবল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে রইলেন।

৬. মুখের চেহারা কী হয়েছে

মুখের চেহারা কী হয়েছে দেখেছেন?

লালমোহনবাবু তক্তপোষে বসে হাতে তাঁর দাড়ি কামানোর আয়নাটা নিয়ে তাতে নিজের মুখ দেখে মন্তব্যটা করলেন। ওঁর মুখের যা অবস্থা, আমাদের সকলেরই তাই।

গোসাঁইপুরের ওই একটা ড্রব্যাক, বললেন তুলসীবাবু।এটার বিষয় আপনাদের আগে থেকেই ওয়ার্নিং দেওয়া উচিত ছিল।

আপনি গোসাঁইপুর বলছেন, আমি বলব মল্লিকবাড়ির বাগানে, বললেন লালমোহনবাবু। ওইটেই হল মশার ডিপো।

দুপুরের খাওয়া শেষ করে আমরা দোতলায় আমাদের ঘরে এসে বসেছি। পুলিশ এসে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে। ফেলুদা এভাবে গুম মেরে গেছে কেন বুঝতে পারছি না। আমার বিশ্বাস জীবনবাবুর খুনটা ওর কাছে এতই অপ্রত্যাশিত যে ওর ক্যালকুলেশন সব গণ্ডগোল হয়ে গেছে। আর ডাকাতই যদি খুনটা করে থাকে, তা হলে তদন্তের মজাটা কোথায়? ডাকাত ধরার রাস্তা তো পুলিশের ঢের বেশি ভাল জানা আছে; সেখানে একজন প্রাইভেট গোয়েন্দা আর কী করতে পারে?

দারোগী সুধাকর প্রমাণিক ইতিমধ্যে ফেলুদার সঙ্গে এসে কথা বলে গেছেন। তিনি ফেলুদার নাম শুনেছেন, তবে ফেলুদার উপর খুব একটা ভক্তিভাব আছে বলে মনে হল না। বিশেষ করে জীবনবাবুর লাশ লোপাট হয়ে যাওয়াতে তিনি রীতিমতো বিরক্ত।

আপনারা যাঁরা শখের ডিটেকটিভ, বললেন সুধাকর দারোগ, তাদের দেখেছি কাজের মধ্যে সিসটেমের কোনও বালাই নেই। আরেকজন দেখেছি আপনার মতো গণেশ দত্তগুপ্ত– তার সঙ্গে একটা কেসে ঠোকাঠুকি লাগে। যেখানে দরকার অ্যাকশনের, সেখানে চোখ

কুঁচকে বসে ভাবছে। কী যে ভাবছে তা মা গঙ্গাই জানে। আবার যেখানে কাজ করছে, তার পেছনে কোনও চিন্তা নেই। লাশটা যখন দেখলেন পড়ে আছে, আর সেটাকে ছেড়ে যদি যেতেই হয় তো একটা লোককে পাহারায় বসিয়ে যেতে পারলেন না? এখন আমাদের ওই পেছনের পুকুরের জলে জাল ফেলতে হবে। আর তাতে যদি বডি না ওঠে তো ভেবে দেখুন-এই গাঁয়ে এগারোটা পুকুর, তার মধ্যে একটাকে দীঘি বলা চলে! আর তাতেও যদি না হয় তা হলে.এ সবই কিন্তু আপনার নেগলিজেন্সের জন্য।

ফেলুদা পুরো ঝালটা হজম করে উলটে একটা বেয়াড়া প্রশ্ন করে সুধাকর দারোগকে আরও উসকে দিল।

আপনি প্রেতাত্মায় বিশ্বাস করেন?

দারোগা কিছুক্ষণ অবাক হয়ে ফেলুদার দিকে চেয়ে থেকে মাথা নেড়ে বললেন, আপনার সিরিয়াস বলে খ্যাতি আছে শুনেছিলুম, এখন দেখছি সেটাও ভুল।

ফেলুদা বলল, কথাটা জিজ্ঞেস করলাম। কারণ আপনারা যদি খুনি ধরতে না পারেন তা হলে আমাকে মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যের শরণাপন্ন হতে হবে। তিনি প্রেতাত্মা নামাতে পারেন। আমার মনে হচ্ছে জীবনলালের আত্মাই জীবনলালের খুনির সঠিক সন্ধান দিতে পারেন।

আপনি নিজে তা হলে হাপলেস ফিল করছেন বলুন।

খুনের তদন্ত আমার সাধ্যের বাইরে সেটা স্বীকার করছি, বলল ফেলুদা, কিন্তু ডাকাতের হাতে হাতকড়া পরাতে পারব বলে আমার বিশ্বাস আছে।

সুধাকরবাবুর যে ফেলুদার উপর আস্থা কত কম সেটা তাঁর পরের কথা থেকেই বুঝতে পারলাম!

আপনি ডেড় বডি আয় জ্যাস্ত বডি তফাত করতে পারেন। আশা করি? গলায় ফাঁস দিয়ে টান মারলে কী কী পরিবর্তন হয় সেটা জানা আছে আপনার?

ফেলুদা ঠাণ্ডা ভাবেই উত্তরটা দিল।

সুধাকরবাবু, আমার যখন পুলিশে চাকরি নেবার কোনও বাসনা নেই, তখন আপনার প্রশ্নের জবাব দেওয়াটা আমার মর্জির ব্যাপার। পুলিশের উপর নির্ভর না করে যখন আমি প্রেতাত্মার কথা বলছি তখন বুঝতেই পারছেন আমার তদন্তের রাস্তাটা একটু স্বতন্ত্র।

ভোলানাথবাবু সম্পর্কে আপনার মনে কোনও সন্দেহের ভাব নেই?

নিশ্চয়ই আছে। আমার সন্দেহ হয় আপনারা দিগ্‌বিদিক বিবেচনা না করেই ভদ্রলোকের হাতে হাতকড়া পরাবেন, কারণ তাঁর পূর্বপুরুষ যে জীবনবাবুর পূর্বপুরুষের দ্বারা লাঞ্ছিত। হয়েছিলেন সে খবর হয়তো আপনাদের কানো পৌঁছেছে। কিন্তু সেটা করলে আপনারা মারাত্মক ভুল করবেন।

সুধাকর দারোগ সশব্দে হেসে মোড়া থেকে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ফেলুদার দিকে চেয়ে চুক চুক করে আক্ষেপের শব্দ করে বললেন, মুশকিল হচ্ছে কী জানেন, আপনারা বেশি ভেবে সহজ জিনিসটাকে জটিল করে ফেলেন। কেসটা জলের মতো পরিষ্কার।

আপনাদের জাল ফেলা পুকুরের জলের মতো?

ফেলুদার খোঁচা অগ্রাহ্য করে দারোগা বলে চললেন, আপনি একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারতেন কেন ভোলানাথবাবুর কথা বলছি। ডাকাতি এবং খুন দুটোর জন্যেই সে দায়ী। এ ডাকাতি ঘরের লোকের কাজ সে তো বোঝাই যায়। আসল ডাকাত হলে সিন্দুক ভাঙত-চাবি দিয়ে খুলত না। ভোলানাথ টাকা নিয়ে পালাচ্ছিল, পিছনের বাগান দিয়ে, খুন করবার কোনও অভিপ্রায় ছিল না তার। জীবনবাবু ঘুম ভেঙে ট্টের পেয়ে তাকে ধাওয়া করেন; ভোলানাথ খুন করতে বাধ্য হয়। তারপর সন্দেহ যাতে না পড়ে। তাই আপনাদের খবর দিতে আসে। ভোলানাথ বলেছে ডাকাত তাকেও বেঁধে রেখেছিল, জীবনবাবু এসে তার বাঁধন খোলে। এ কথা যে সত্যি তার প্রমাণ কই? এর তো কোনও সাক্ষী নেই।

সিন্দুকের টাকা তা হলে কোথায় গেল সুধাকরবাবু? ফেলুদা গভীরভাবে জিজ্ঞেস করল।

সেইটাকাও খুঁজতে হবে, বললেন সুধাকরবাবু। লাশ পেলে পর আমরা ভোলানাথবাবুকে জেরা করব। তখন সব সুরসুর করে বেরিয়ে পড়বে।

আমার কিন্তু সুধাকরবাবুর কথাগুলো বেশ মনে ধরল; কিন্তু ফেলুদা কেন আমল দিচ্ছে না? দারোগ যখন সিঁড়ি দিয়ে নামছে তখনই কেন সে বলতে গেল, আজি সন্ধ্যায় জীবনলালের আত্মা নামানো হবে মৃগাঙ্কবাবুর বাড়িতে! এলে ঠিকবেন না!

তুলসীবাবুর দেখলাম একমাত্র চিন্তা কালকের সংবর্ধনা হবে কি না সেই নিয়ে; রহস্যের কিনারা না হলে, খুনির হাতে হাতকড়া না পড়লে, নিশ্চয়ই হবে না, কারণ গ্রামের লোকের সংবর্ধনা সভায় যোগ দেবার উৎসাহই হবে না। লালমোহনবাবু অবিশ্যি মেনেই নিয়েছেন যে মালা আর মানপত্র ফসকে গেল, আর স্পিচটা মাঠে মারা গেল। হয়তো নিজেকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই বললেন, আমরা মশাই রহস্য বেচে খাই; বাস্তবিক একটা খাঁটি রহস্যের সামনে পড়লে সেইটেই আমাদের সবচেয়ে বড় পুরস্কার।

মুখে এটা বলা সত্ত্বেও লক্ষ করছি উনি বার বার নিজের অজানতে বিড় বিড় করে স্পিচের লাইন বলছেন, আর বলেই নিজেকে সামলে নিচ্ছেন।

মৃগাঙ্ক ভটাচায্যি কোন বাড়িতে থাকেন বলতে পারেন?

প্রশ্নটা এল তুলসীবাবুর বাড়ির দরজার বাইরে থেকে।

এই শুরু হল, বললেন তুলসীবাবু।সোম আর শুকুরে এ উপদ্রব লেগেই আছে, আর রাস্তায় প্রথম বাড়ি বলে আমাকেই এ ঝক্কি পোয়াতে হয়।

ভদ্রলোক জানালা দিয়ে নীচের দিকে চেয়ে বললেন, আরও তিনটে বাড়ি পরে ডান দিকে।

ফেলুদা বলল, আমরা আসছি বলে খবরটা পাঠিয়ে দিতে পারলে ভাল হত। আর বলবেন কিউয়ে দাঁড়াতে পারব না। আমাদের আত্মাকে প্রাইয়রিটি দিতে হবে।

তুলসীবাবু বোধহয় এই প্রথম বুঝলেন যে ফেলুদা ব্যাপারটা সম্বন্ধে সত্যিই সিরিয়াস। তাঁর মুখের ভাব দেখে ফেলুদা বলল, আমার একার কাজ ফুরিয়ে গেছে তুলসীবাবু। এখন ভটচায্যি মশাইয়ের সাহায্য ছাড়া এগোতে পারব না।

ফেলুদা অনেক সময়ই বলে যে মনের দরজা খোলা রাখা উচিত, বিশেষ করে আজকের দিনে; কারণ রোজই প্রমাণ হচ্ছে যে এমন অনেক ঘটনা পৃথিবীতে ঘটে যার কারণ বৈজ্ঞানিকেরা জানে না, অথচ জানে না বলে সেটাকে উড়িয়েও দিতে পারছে না। এই যেমন সেদিন কাগজে বেরোল যে ইউরি গেলর বলে এক হুইদি যুবক চোখের চাহনির জোরে পাঁচ হাত দূর থেকে বৈজ্ঞানিকের হাতে ধরা কাঁটা চামচ বেঁকিয়ে ফেলছে। এ ঘটনা চোখের সামনে দেখছে আরও একজন ডাকসাইটে বৈজ্ঞানিক, আর দেখে তারা না পারে কারণ বলতে, না পারে উড়িয়ে দিতে। মৃগাঙ্কবাবুর ক্ষমতাও কি এই ধরনের?

তুলসীবাবু বললেন, সাড়ে পাঁচটা বাজে; চলুন আমি আপনি একসঙ্গে গিয়ে ওঁকে রিকোয়েস্টটা করি, তা হলে জোরটা বেশি হবে।

ফেলুদা উঠে পড়ে বলল, তোরা বরং একটু বেড়িয়ে আয় না।

আমার নিজেরও এক ঘরে বেশিক্ষণ বসে থাকতে ভাল লাগছিল না, লালমোহনবাবুও বলছিলেন গোসাঁইপুরের শরৎকালের বিকেলের তুলনা নেই, তাই ফেলুদার বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গেই আমরাও দুজন বেরিয়ে পড়লাম।

৭. মূকাভিনেতা বেণীমাধব

দুদিন আগে যখন এসেছিলাম, তখন একরকম মনে হয়েছিল গ্রামটাকে; আজ আমার মনে হচ্ছে আরেক রকম। তার কারণ মন বলছে এই সুন্দর গ্রামের কোনও একটা গোপন জায়গায় গলায়-ফাঁসি-দিয়ে-মরা মানুষের লাশ লুকিয়ে আছে। হঠাৎ যদি দেখি—

নাঃ—ও সব ভাবব না। তা হলে বেড়ানো মাটি হয়ে যাবে।

কিন্তু বাঁশি বনের মধ্যে দিয়ে এগোতে এগোতে আলো কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে সাহসটা আবার কমে গিয়েছিল। সেটাকে বাড়িয়ে দিল মূকাভিনেতা বেণীমাধব।

আরে, আমি যে আপনাদের বাড়িই যাচ্ছিলাম। বললুম না শুকুরবার বিকেলে এসে অভিনয় দেখিয়ে যাব।

কী করি বলে ভাই, বললেন লালমোহনবাবু।এমন একটা বিপর্যয় ঘটে যাবে সে কি জানতাম? এর পরে আর অ্যাকটিং দেখার মুড থাকে? তুমিই বলো।

তা যা বলেছেন স্যার। তা আপনারা ক'দিন আছেন তো?

হ্যাঁ, তা দিন তিনেক তো আছিই।

এ দিকে চল্লেন কোথায়?

কোনদিকে যাওয়া যায় তুমিই বলো না।

বাদুড়ে-কালী দেখেছেন স্যার? সপ্তদশ শতাব্দীর টেম্পল। এখনও কিছু হাতের কাজ রয়ে গেছে দেয়ালে। চলুন দেখিয়ে দিচ্ছি।

আমি যে সকলে দেখেছি মন্দিরটা সেটা আর বললাম না। সত্যি বলতে কী, তখন যা মনের অবস্থা ছিল তাতে হাতের কাজটাজ চোখে পড়েনি।

মিনিট তিনেক যেতেই মন্দিরটায় পৌঁছে গেলাম। এখানে সকালেই আসা উচিত। সন্ধেবোলা গা-টা একটু ছমছম করে। পাশেই আবার একটা বটগাছ। তার একটা বুরি মন্দিরের চুড়োটাকে আকড়ে ধরে খুলি ফাটিয়ে দিয়েছে।

এইখেনটায় বলি হত। স্যার, বটগাছের গুড়ির পাশে একটা জায়গা দেখিয়ে বলল বেণীমাধব।

বলি? লালমোহনবাবু কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন।

নরবলি, স্যার। গোসাঁইপুরের ডাকাত ওয়ার্লড ফেমাস নেদো ডাকাতের ইতিহাস পড়েননি? ওই নিয়েই তো আপনার একটা রহস্য-রোমাঞ্চের বই হয়ে যায়। ভেতরটা দেখবেন? টর্চ আছে?

ভেতরটা এর মধ্যে অন্ধকার হয়ে গেছে।

ভেতর? ধরা গলায় বললেন লালমোহনবাবু। টর্চ তো আনিনি ভাই। শুনিচি বাদুড়-টাদুড়...

বাদুড়ের তো এখন ইভিনিং এক্সকারশন স্যার। এইতো সবে চরতে বেরিয়েছে। বাদুড় দেখতে চাইলে–

না ভাই, চাই না। বরং না দেখাটাই বাঞ্ছনীয়।

চলে আসুন স্যার। মাচিস জ্বেলেছি। একটা বিড়ি ধরালুম স্যার।কিছু মাইন্ড করবেন না তো।

নো নো ভাই, মাইন্ড কী, তুমি পাঁচটা বিড়ি একসঙ্গে ধরাও না।

বেণীমাধব বিড়ি ধরিয়ে জ্বলন্ত দেশলাইটা মন্দিরের দরজার জায়গায় ধরলা, আর আমনি এক লাফে আমার হৃৎপিণ্ডটা গলার কাছে চলে এল। লালমোহনবাবু চারবার জী-জী-জী-জী বলে থেমে গেলেন।

জীবনবাবুর মৃতদেহ! মন্দিরের ভিতরে থামের আড়ালে নীল পাঞ্জাবি আর সাদা পায়জামার খানিকটা উঁকি মারছে। সকালে হাতে ঘড়ি ছিল, এখন নেই।

এই দেখুন, কে কাপড় ফেলে গেছে।

বেণীমাধব দিব্যি -এগিয়ে যাচ্ছিলেন, বোধহয় কাপড়গুলো উদ্ধার করে তার মালিককে ফেরত দিতে, লালমোহনবাবু তার শার্টের কোনা খামচে ধরে বললেন, ওটা লা-লাশ! পুশ-পুশ পুশ পুলিশের ব্যাপার!

মূকাভিনেতা লাশ শুনেই মূক মেরে গিয়েছিলেন—এইবার দেখলাম তার অভিনয়। অবাক থেকে শুরু করে এক ধাপে আতঙ্কে পৌঁছে তিনি দেখিয়ে দিলেন কথা না বলে কী করে পিটুটান দেওয়ার অভিনয় করতে হয়। আমরাও আর অপেক্ষা না করে এই বিভীষিকাময় পরিবেশ থেকে ঘুরে জোরে হেঁটে বাড়িমুখে রওনা দিলাম।

ফেলুদা দেখলাম ফিরে এসেছে। বলল, আমন ফ্যাকাশে মেরে গেছিস কেন? চটপট রেডি হয়ে নে। পনেরো মিনিটের মধ্যে আত্মা নামবে।

লালমোহনবাবু ফেলুদাকে দেখেই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। বললেন, একটা ইম্পরটান্ট ডিসকভারি করে এলুম। অবিশ্যি এক নয়, দুজনে। জীবনবাবুর লাশ পড়ে রয়েছে বাদুড়ে কালীর মন্দিরে। পুলিশকে জানাবেন, না খুঁজতে দেবেন?

আমি জানতাম সুধাকর দারোগাকে লালমোহনবাবুর মোটেই পছন্দ হয়নি, তাই খুঁজতে দেবেন। ফেলুদা বলল, মন্দিরের ভেতরে গেসলেন?

নো স্যার। লাশ তো হ্যান্ডল করা বারণ, তাই আর যাইনি। তবে বিয়ান্ড ডাউট জীবন মল্লিক।

ঠিক আছে। সুধাকরবাবু এসছিলেন একটু আগে। বোধহয় ভট্টাচার্য মশায়ের ওখানে আসছেন। তখন খবরটা দিয়ে দিলেই হবে।

দশ মিনিটের মধ্যে আমরা রওনা দিয়ে দিলাম। তুলসীবাবু বললেন যে একবার উকিলবাবুর বাড়ি থেকে চন্ট করে ঘুরে আসতে হবে। কালকের অনুষ্ঠানটা যে ভেস্তে যেতে পারে সেটা ওঁকে জানানো দরকার।

যাবার পথে ফেলুদা বলল যে মৃগাঙ্কবাবু নাকি জীবনলালের আত্মা নামানোর ব্যাপারে আপত্তি দূরের কথা, রীতিমতো আগ্রহ দেখিয়েছেন। বাইরে থেকে আরও জন তিনেক লোক এসেছেন, তাদের বাইরে বসিয়ে রেখে আগে আমাদের কাজটা করে দেবেন।

মৃগাঙ্কবাবুর ঘরে আজ তক্তপোষের বদলে রয়েছে একটা কাঠের টেবিল, আর সেটাকে ঘিরে টিন আর কাঠে মেশানো পাঁচটা চেয়ার। এরই একটাতে বসে আছেন মৃগাঙ্ক ভটিচার্য। টেবিলের মাঝখানে রয়েছে একটা পিদিম, আর তার পাশেই একটা কাগজ আর পেনসিল। এ ছাড়া ঘরে রয়েছে দুটোর বদলে একটা বেঞ্চি, আর দুটো মোড়া। বেঞ্চিতে বসে আছে ভাগনে নিত্যানন্দ।

আমরা তিনজনে তিনটে চেয়ারে বসলাম, একটা খালি রইল তুলসীবাবুর জন্য।

তুলসীচরণের জন্য অপেক্ষা করব কি? প্রশ্ন করলেন মৃগাঙ্কবাবু।

পাঁচ মিনিট দেখা যেতে পারে, বলল ফেলুদা।

আমি জানতাম। সেদিন আপনাকে দেখেই উপলব্ধি হয়েছিল যে আমার কাছে আব্বার আসতে হবে। ভদ্রলোকের গলাটা এই অন্ধকার ঘরে গমগম করছে। মৃগাঙ্কবাবু বলে চললেন, বিজ্ঞান অর্থ বিশেষ জ্ঞান; পরলোকগত আত্মার সঙ্গে যোগস্থাপন হল এই বিশেষ

জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। সুতরাং যারা প্রকৃত বৈজ্ঞানিক, তারা এই বিশেষ জ্ঞানকে হেয় জ্ঞান করে না।

জ্ঞান জ্ঞান করে এই ঘ্যানঘ্যাননি আমার ভাল লাগছিল না। ভদ্রলোক এবার আরম্ভ করলেই পারেন।

আপনারা সকলেই পরলোকগত জীবনলালকে প্রত্যক্ষ করেছেন, এবং তিনি সদ্য মৃত। এই দুই কারণে আজকের অধিবেশনের চূড়ান্ত সাফল্য আমি আশা করি। আত্মা এখনও নরলোক হতে পরলোকে উত্তীর্ণ হবার অবকাশ লাভ করেনি। অনেক পার্থিব বন্ধন মুক্ত করে তবে আত্মার উত্তরণ। জীবনলালের আত্মা এখনও আমাদের পরিপার্শ্বে বিদ্যমান। সে আমার আবাহনের অপেক্ষায় আছে। সে জানে আমি তাকে ডাকলে পাব, আমি জানি তাকে ডাকলে সে আসবে। জীবনলালের আত্মা ত্রিকালজ্ঞ, অবিনশ্বর। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে তার অবাধ গতি। আমার এই লেখনী হবে তারই লেখনী। তারই জ্ঞান, তারই উপলব্ধি, তারই বিশ্বাস, ব্যক্তি হবে তারই ভাষায় আমার এই লেখনীর সাহায্যে।

এবার ফেলুদার মুখ খুলল! এ অবস্থায় কথা বলা ওর পক্ষেই সম্ভব, কেননা আমার গলা শুকিয়ে গেছে, আর আমার বিশ্বাস লালমোহনবাবুরও।

আপনি কী লিখছেন সেটা জানার জন্য সকলেরই কৌতুহল হবে, অথচ আমি ছাড়া আর সকলেই টেবিলের উলটা দিকে বসেছে, লেখা পড়া সম্ভব নয়। আমি যদি সকলের সুবিধের জন্য পড়ে দিই তাতে আপনার আপত্তি আছে কি?

কোনও আপত্তি নেই, বললেন মৃগাঙ্কবাবু, আপনি স্বচ্ছন্দেই লেখা পড়ে শুনিয়ে দিতে পারেন। আপনার জিজ্ঞাস্য তো একটাই, নয় কি?

তিনটে-ডাকাতের পরিচয়, খুনির পরিচয় এবং কখন কী ভাবে খুনিটা হয়।

উত্তম, বললেন মৃগাঙ্কবাবু।

৮. হাতে হাতকড়া

পাঁচ মিনিটের মধ্যেও তুলসীবাবু এলেন না দেখে মৃগাঙ্কবাবু কাজ আরম্ভ করে দেওয়া স্থির করলেন। মনে মনে বললাম।–তুলসীবাবু এ জিনিস অনেক দেখেছেন, তাঁর পুরোটা না দেখলেও চলবে।

অনুগ্রহ করে আপনাদিগের প্রত্যেকের হস্তদ্বয় অঙ্গুলি প্রসারিত করে এই টেবিলের উপর স্থাপন করুন।

কাঠের টেবিলে হাতগুলো রাখার সঙ্গে সঙ্গে যে একটা টক টক শব্দ শুরু হল সেটা আর কিছুই না, লালমোহনবাবুর কাঁপা আঙুল টেবিলের উপর তবলার বোল তুলে ফেলছে। ভদ্রলোক দাঁতে দাঁত চেপে হাত স্টেডি করলেন।

মৃগাঙ্কবাবুর চোখ বন্ধ, ঠোঁট নড়ছে। চারিদিক একেবারে নিস্তব্ধ বলেই বুঝলাম উনি ফিস ফিস করে একটা শ্লোক আওড়াচ্ছেন।

এক মিনিট পরে সেটাও বন্ধ হয়ে গেল। এবারে যাকে ইংরিজিতে বলে ডেথলি সাইলেন্স। পিন্দিমের শিখা কাঁপছে, আর তার চার পাশে ঘুর ঘুর করছে তিনটে ফড়িং। ঘরের চারিদিকের দেয়ালে চারটে মানুষের ছায়া থর থর করে কাঁপছে। আড়চোখে ফেলুদার দিকে চেয়ে তার মনের অবস্থা কিছু বুঝতে পারলাম না। চায়াল শক্ত, চোখের পাতা প্রায় পড়ছেই না, দৃষ্টি সটান মৃগাঙ্কবাবুর দিকে। মৃগাঙ্কবাবু নিজে যেন পাথরের মূর্তি। এর মধ্যে কখন যে পেনসিলটা তার হাতে চলে গেছে জানি না। সেটা এখন খাতার সাদা পাতার উপর ধরা, শিসের ডগাটা ঠেকে রয়েছে। কাগজের সঙ্গে।

এবার মৃগাঙ্কবাবুর ঠোঁটে কাঁপুনি আরম্ভ হল। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। আমার পাশে আবার তবলার বোল শুরু হয়েছে, এখন আওয়াজটা রীতিমতো ভৌতিক বলে মনে হচ্ছে। অনেকেরই এ অবস্থায় এভাবে হাত কাঁপতে পারে, যদিও আমার কাঁপছে শুধু বুক।

জীবনলাল, জীবনলাল, জীবনলাল...

তিনবার পর পর অতি আস্তে উচ্চারণ হল নামটা। মৃগাঙ্কবাবুর ঠোঁটটা নড়ল কি না তাও ভাল করে বুঝতে পারলাম না।এসেছেন? আপনি এসেছেন?

প্রশ্ন এল আমাদের চমকে দিয়ে আমাদের পিছন থেকে। এইবারে বুঝলাম নিত্যানন্দের ভূমিকাটা কী। মৃগাঙ্কবাবু নিজে এই অবস্থায় কথা বলেন না। হয়তো বলা সম্ভবই না। এসেছি।

ফেলুদার গলা। খাতায় লেখা হয়েছে ফেলুদা সেটাই পড়ে বলেছে।

আমার চোখ মৃগাঙ্কবাবু হাতের দিকে গেল। পিছন থেকে প্রশ্ন এল, তুমি কোথায় আছ?

কাছেই—পড়ে বলল ফেলুদা।

কতগুলি প্রশ্ন তোমাকে করা হবে, সেগুলোর জবাব দিতে পারবে? পেনসিল নাড়ল।

পারব—পড়ে বলল ফেলুদা।

সিন্দুক খুলে টাকা নিল কে? আমি।

তোমাকে যে হত্যা করল, তাকে দেখেছিলে? হ্যাঁ।

চিনেছিলে? হ্যাঁ।

কে সে? বাবা।

কিন্তু কী ভাবে খুনটা করা হল সেটা আর জানা হল না, কারণ প্রশ্নটা হবার সঙ্গে সঙ্গে এতেই হবে বলে ফেলুদা উঠে দাঁড়াল। তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, তোপ্‌সে, ওই লণ্ঠনটা আন তো—দরজার বাইরে রাখা রয়েছে। আলো বড় কম।

আমি ভ্যাবাচ্যাকা, লণ্ঠনটা এনে টেবিলের উপরে রাখলাম।

ফেলুদা মৃগাঙ্কবাবুর সামনে থেকে কাগজটা তুলে নিল। তারপর উত্তরগুলোর দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, মৃগাঙ্কবাবু, আমার মনে হচ্ছে আপনার এই আত্মটি এখনও ঠিক ত্রিকালজ্ঞ হয়ে উঠতে পারেনি, কারণ প্রশ্নোত্তরে কতগুলো গোলমাল পাচ্ছি।

মৃগাঙ্কবাবু কটমট করে ফেলুদার দিকে চাইলেন, যেন এক চাহনিতে ফেলুদাকে ভস্ম করবেন। ফেলুদা তাঁকে অগ্রহ করে বলে চলল, যেমন, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে সিন্দুক খুলে টাকা নিল কে, উত্তর হচ্ছে—আমি। কিন্তু সিন্দুকে তো টাকা ছিল না মৃগাঙ্কবাবু!

ম্যাজিকের মতো মৃগাঙ্কবাবুর মুখ থেকে ক্রোধের ভাবটা চলে গিয়ে সেখানে দেখা দিল সংশয়। ফেলুদা বলল, টাকা ছিল না বলছি। এই কারণে যে সিন্দুক খুলেছিল জীবনলাল নয়, খুলেছিল প্রদোষ চন্দ্র মিত্র। অবিশ্যি জীবনবাবু এই ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেছিলেন। তিনিই মাঝরাত্তিরে দরজা খুলে আমাকে ঢুকতে দেন, তিনিই বলে দেন যে তাঁর বাবার বালিশের তলায় থাকে সিন্দুকের চাবি; ভোলানাথবাবু আর শ্যামলালবাবুকে বাঁধার ব্যাপারেও অবিশ্যি তিনি আমাকে সাহায্য করেন। যাই হাক, সিন্দুকে টাকার বদলে যেটা ছিল সেটা হল–

ফেলুদা পকেট থেকে আর একটা কাগজ বের করল। এটাও খাতার কাগজ, এটাতেও পেনসিল দিয়ে লেখা।

এই কাগজটাই, বলল ফেলুদা, শ্যামলালবাবুর কাছ থেকে চেয়ে আমি পাইনি। এটার প্রয়োজন হয়েছিল। এই কারণেই যে মৃগাঙ্কবাবুর সততা সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়েছিল, আর সেটা হয়েছিল একেবারে প্রথম দিনের সাক্ষাতের পরেই। আমার সঙ্গে আলাপ হবার পরমুহূর্তেই তিনি ভান করলেন যে আমার নাম এবং পেশা তিনি অলৌকিক উপায়ে জেনে ফেলেছেন। আসলে এগুলো কিন্তু তাঁকে আগেই জানিয়ে রেখেছিলেন। তুলসীবাবু। তাই নয়, তুলসীবাবু?

তুলসীবাবু এর মধ্যে কখন যে অন্ধকারে ঘরে ঢুকে মোড়ায় বসেছেন তা দেখিইনি। ভদ্রলোক ফেলুদার কথায় ভারী অপ্রস্তুত হয়ে আমতা আমতা করে বললেন, মানে আপ্পার মনে, ইয়ে, যদি একটু ভক্তিভাব জাগে...

ফেলুদা তাঁকে থামিয়ে বলল, দোষ আমি আপনাকে দিচ্ছি না তুলসীবাবু। আপনি তো আর নিজেকে মহৎ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন না। কিন্তু ইনি করেন। যাই হাক, এই ভণ্ডামির গন্ধ পেয়েই আমি কাগজটা পেতে বদ্ধপরিকর। আমার আশা ছিল শ্যামলালবাবু সম্পর্কে কয়েকটা খটকার উত্তর আমি এই কাগজে পাব।

পিন্দিমের আলোতেও বুঝতে পারলাম মৃগাঙ্কবাবুর কপাল ঘেমে গেছে। ফেলুদা কাগজটা আলোয় ধরে বলল, দুর্লভ মল্লিকের আত্মা এই কাগজে তাঁর ছেলের কিছু প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নগুলো মুখে করা হয়েছিল, তাই এতে লেখা নেই; কিন্তু উত্তরগুলো থেকে প্রশ্নগুলো অনুমান করা যায়। আমি উত্তরের পাশে পাশে সেগুলো লিখেছি, এবং সেই ভাবেই পড়ে শোনাচ্ছি; আমার ভুল হলে সংশোধন করে দেবেন মৃগাঙ্কবাবু!

মৃগাঙ্কবাবুর দ্রুত নিশ্বাসে প্রদীপের শিখা কেঁপে কেঁপে উঠছে। ফেলুদা পড়া আরম্ভ করল—

এক নম্বর প্রশ্ন—আমার শত্রু কে? উত্তর—ঘরেই আছে।

সে কি আমার মৃত্যু কামনা করে—না। তবে কী চায়?—টাকা। টাকা রক্ষার উপায় কী?—সিন্দুকে রেখো না। কোথায় রাখব?—মাটির নীচে। কোনখানে?—বাগানে। বাগানের কোথায়?—উত্তরে। উত্তরে কোথায়?—আম গাছের নীচে। কোন আম গাছ?—দেয়ালের ফাটলের ধারে।

ফেলুদা এবার হাতের কাগজটা টেবিলের উপরে রেখে বলল, শ্যামলালবাবুর পায়ের তলায় মাটি এবং গায়ে মশার কামড় দেখে মনে হয়েছিল। তিনি কোনও কারণে বাগানে গিয়ে সেখানে কিছুটা সময় কাটিয়েছেন। আজ জানি তিনি এই কাগজের— অর্থাৎ

মৃগাঙ্কবাবুর-নির্দেশ অনুযায়ী সিন্দুক থেকে টাকার বাক্স বার করে মাটিতে পুঁতিতে গিয়েছিলেন। টাকা লুকিয়ে রাখার এই প্রাচীন পন্থা শ্যামলালবাবুর মনঃপূত হবে এটা মৃগাঙ্কবাবু বুঝেছিলেন। এই টাকার উপর মৃগাঙ্কবাবুর লোভ অনেক দিনের, কিন্তু বিশ্বস্ত ভোলানাথ যদ্দিন আছেন তদিন সিন্দুকের নাগাল পাওয়া অসম্ভব। প্রথমে চেষ্টা করেছিলেন ভোলানাথবাবুর উপর শ্যামলালের সন্দেহ ফেলে তাকে হাঁটানোর। সেটা সফল হয়নি। কিন্তু সেই সময় আশ্চর্য সুযোগ এসে যায়। শ্যামলালবাবু নিজেই মৃগাঙ্কবাবুকে ডেকে পাঠান আত্মা নামানোর জন্য। মৃগাঙ্কবাবু তাঁর আশ্চর্য বুদ্ধি বলে এক টিলে দুই পাখি মারেন; শ্যামলালের ঘরের লোককেই শ্যামলালের শত্রু করে দেন, এবং টাকার বাক্স সিন্দুক থেকে বার করিয়ে বাগানে অন্যান। সেই বাক্স কাল সন্ধ্যাবেলা–

একটা শব্দ শুনে পিছন ফিরে দেখি ভাগনে বেঞ্চি ছেড়ে দরজার দিকে একটা লাফ মেরেছে। কিন্তু ঘর থেকে বেরোনো আর হল না। কারণ দুটো শক্ত হাত তাকে বাধা দিয়েছে। এবার হাতের মালিক ভাগনে সমেত ভিতরে ঢুকলেন। আরেব্বাস-এ যে সুধাকর দারোগা : দারোগ বললেন, বাক্সটা পেয়েছি মিস্টার মিত্তির; একটা ট্রাঙ্কের মধ্যে কাপড়ের নীচে রাখা ছিল। মণীশ–দাও তো!

একজন কনস্টেবল একটা স্টিলের বাক্স নিয়ে ঘরে ঢুকে সেটাকে টেবিলের উপর রাখল।

এর ডালা তো ভেঙেই ফেলা হয়েছে দেখছি, বলল ফেলুদা।

বাক্স খুলতে লণ্ঠন আর পিন্দিমের আলোয় তাড়া তাড়া একশো টাকার নোট দেখেই বুঝলাম। এত টাকা আমি একসঙ্গে কখনও দেখিনি।

কিন্তু খুন? হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন মৃগাঙ্কবাবু।খুন করল কে? খুন তো আমি করিনি!

খুন একজনই করেছে মৃগাঙ্কবাবু!–ফেলুদার গলা যেন খাপখোলা তলোয়ার্ক্স–এবং তারও নাম প্রদোষ চন্দ্র মিত্র। খুন হয়েছে। আপনার ভণ্ডামি, আপনার শয়তানি, আপনার লোভ। এর কোনওটাই আর কোনওদিনও মাথা তুলতে পারবে না, কারণ সকলেই জানবে যে

আপনি আজ অপূর্ব ক্ষমতাবলে একটি জীবন্ত ব্যক্তির আত্মাকে পরলোক থেকে ডেকে এনেছেন আপনার এই ঘরে—আসুন, জীবনবাবু!

এবার পিছন নয়, সামনের দরজা দিয়ে ঢুকলেন জীবনলাল মল্লিক। তাঁকে দেখেই মৃগাঙ্কবাবু যে কথাটা বলে আর্তনাদ করলেন, সেটা লালমোহনবাবুর বিশ্বাস হা হতোহস্মি, কিন্তু আমি যেন শুনলাম হায়! হাতে হাতকড়া।

***

অবিশ্যি হাতে হাতকড়া পড়েছিল ঠিকই। সুধাকরবাবু শুধু একটা অভিযোগ করলেন ফেলুদাকে—মিছিমিছি দুটো পুকুরে জাল ফেললেন আমাদের দিয়ে।

কী বলছেন সুধাকরবাবু, বলল ফেলুদা,জীবনবাবু খুন হয়েছে। এ ধারণা সকলের মনে বদ্ধমূল না হলে মৃগাঙ্কবাবুর ভণ্ডামি হাতেনাতে ধরব কী করে?

জীবনবাবু খুনের ব্যাপারটা শুধুই মৃগাঙ্কবাবুকে সায়েস্তা করার জন্য। একেবারে প্ল্যান করে ভাঁওতা। এদিকে আমি আর ফেলুদা, আর ওদিকে লালমোহনবাবু ও ভোলানাথবাবু চলে যাওয়া মাত্র ভদ্রলোক বাগান থেকে উঠে বাড়িতে ফিরে গিয়ে দোতলার পিছন দিকের একটা গুন্দোম ঘরে গা ঢাকা দেন। যাবার পথে ঠাকুমা দেখে ফেলেছিলেন, কিন্তু সেটা ফেলুদা ম্যানেজ করে। আজ সন্ধ্যায় তিনি আবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন। মৃগাঙ্কবাবুর বৈঠকের শেষে আত্মপ্রকাশ করবেন বলে! সেই সময় বাঁশ বনে দূর থেকে আমাদের দেখে বাদুড়ে কালীমন্দিরে ঢুকে মড়া সেজে পড়ে থাকতে হয়।

রাত্রে খাবার সময় তুলসীবাবু কাঁচুমাচু ভাব করে ফেলুদাকে বললেন, আপনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হননি তো?

অসন্তুষ্ট? বলল ফেলুদা, আপনি আমাকে কতটা হেলপ করেছেন জানেন? লোকটা সেদিন আমার নাম নিয়ে হেঁয়ালি না করলে তো ওর ওপর আমার সন্দেহই পড়ত না! আমার তো আপনাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।

আজ জীবনবাবু আমাদের বাড়িতে যাচ্ছিলেন। বললেন, আমি বেক্সেবার আগে বাবাকে প্রণাম করে এলাম।

কী মনে হল? জিজ্ঞেস করল ফেলুদা।

তাজ্জব বনে গেলাম, বললেন জীবনবাবু।আমার মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ব্যবসা কেমন চলছে।

লালমোহনবাবু এতক্ষণ মাছের মুড়ো চিবোচ্ছিলেন বলে কিছু বলেননি। এবার তুলসীবাবুর দিকে ফিরে বললেন, তা হলে কালকের ইয়েটা–?

হচ্ছে বইকী। এখন তো আর কোনও বাধা নেই।

ভেরি গুড। আমার ইয়েটাও রেডি আছে।